KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৪৯/৪ ৪৯/৫ ৪৯/৬ ৪৯/৭	Year of Publication শ্রাবণ ১৩৯৫ ॥ Aug 1988 ভাদ্র ১৩৯৫ ॥ Sep 1988 আশ্বিন ১৩৯৫ ॥ Oct 1988 কার্তিক ১৩৯৫ ॥ Nov 1988 Condition : Brittle Good
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৯ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা নভেম্বর ১৯৮৮

জন্মশতবর্ষে "জওহরলাল নেহরুকে স্মরণ প্রসঙ্গে" বিশেষ করে দেশভাগের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক অকথিত ক্ষোভ এবং বেদনা অভিব্যক্তি পেয়েছে প্রবাদপ্রতিম প্রাক্তন পার্লামেন্টারিয়ান অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনায়।

অকটোবর বিপ্লবের ৭১ বছর পরে বিপর্যস্ত সোভিয়েত অর্থনীতি এবং আদর্শগত সংকট থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত পেরেস্ত্রৈকা আর গ্লাসনস্তের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক অজিত রায়।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে ময়মনসিংহের শেরপুর অঞ্চলে সংগঠিত "পাগলপন্থী" আন্দোলন কিভাবে ধর্মীয় সংস্কার এবং জমিদারি-শোষণ-বিরোধিতার গণ্ডী পেরিয়ে ব্রিটিশবিরোধী রূপ নিয়েছিল ধারাবাহিক নিবন্ধে সেই ইতিহাস বর্ণনা করেছেন অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী।

দুটি জীবনীগ্রন্থকে উপলক্ষ করে মওলানা আজাদ আর জিন্নাহ্ সম্পর্কে অবজেকটিভ আলোচনা করেছেন পুলকনারায়ণ ধর এবং খাজিম আহমেদ।

এই সংখ্যায় "বিষয় ঃ ব্রহ্মদেশ"-এর আলোচ্য বিষয় বর্মী সংগীতকলা।

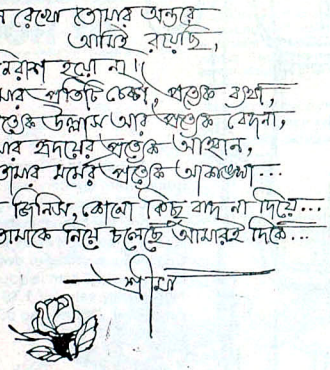

বর্ষ ৪৯। সংখ্যা ৭
নভেম্বর ১৯৮৮
কার্তিক ১৩৯৫

জওয়াহরলাল নেহরুকে স্মরণ প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৭১
ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন বিনয় চৌধুরী ৫৮২
পেরেসত্রোইকা এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্নবায়নের সমস্যা অজিত রায় ৬০৬
বিষয় : ব্রহ্মদেশ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ৬২১

এরিয়েল রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭৭
দৈত্য মরলে বেলাল মোহাম্মদ ৫৭৮
একান্তে পরিমল চক্রবর্তী ৫৮০
সাক্ষাৎকার কিরণশঙ্কর রায় ৫৮১

শ্রীপতি ডোমের স্বদেশচিন্তা সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০০

গ্রন্থসমালোচনা ৬৩৩
পুলকনারায়ণ ধর, খাজিম আহ্‌মদ, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

মতামত ৬৫১
বন্দিরাম চক্রবর্তী, সুনীল সেন, অশোক মৈত্র

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

New Books :

ANDREW ROBINSON
Foreword by
SATYAJIT RAY
THE ART OF
RABINDRANATH TAGORE
£ 50/- Rs. 1325/-
Special Indian Price Rs. 750.00

M. J. AKBAR
NEHRU :
THE MAKING OF INDIA
£ 17 95=Rs. 475 68
Special Indian Price £ 12.95=Rs. 343.18

INDIA :
THE SIEGE WITHIN
£ 4.99=Rs. 132 24
Special Indian Price £ 2.99= Rs. 79.24

BENOZIR BHUTTO
DAUGHTER OF
THE EAST
AN AUTOBIOGRAPHY
£ 12.95=Rs. 343 18
Special Indian Price £ 10/- Rs. 265.00

TOM OWEN EDMUNDS
BHUTAN :
LAND OF THUNDER DRAGON
£ 25/- Rs. 662 50
Special Indian Price £ 20/- Rs. 530.00

Rupa & Co.
15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 073

চতুরঙ্গ

প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা
সডাক গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ৬০ টাকা
যান্মাসিক ৩২ টাকা

এজেন্সির নিয়মাবলী

১। পাঁচ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না।
২। কমিশন শতকরা ২৫। পঁচিশ কপির উর্ধ্বে শতকরা ৩০।
৩। ডাক-খরচ আমরা বহন করি।
৪। কপি-পিছু দেড় টাকা আমাদের দপ্তরে জমা রাখতে হবে।

•

লেখকদের প্রতি নিবেদন

যাঁরা প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠাবেন তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে নকল রেখে পাঠান—অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

অন্যান্য অমনোনীত রচনা যাঁরা ফেরত নিতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে উপযুক্ত পরিমাণে ডাক-টিকিট পাঠালে আমাদের সহায়তা করা হবে।

প্রেরিত রচনায় অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত বিদেশী ব্যক্তিনাম আর স্থাননাম থাকলে, সঙ্গে আলাদা একটি কাগজে ইংরেজি বড়ো হরফে সেগুলি লিখে দিলে উপকার হবে।

জওয়াহরলাল নেহরুকে স্মরণ প্রসঙ্গে

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বহুকাল পরে "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় লিখছি। মনে পড়ছে যে "চতুরঙ্গ"-র প্রতিষ্ঠাতা আর প্রাণপুরুষ, আমার বন্ধু হুমায়ুন কবির-এর অনুরোধে আর হুমায়ুনেরই ক্লান্তিহীন সহকারী আতাউর রহমান-এর সদাসৌজন্যময় অথচ নাছোড়বান্দা আগ্রহে কার্ল মার্কস-কৃত "ক্যাপিটাল" গ্রন্থের প্রধান ঐতিহাসিক পরিচ্ছেদ "ধনিকের আবির্ভাব" ইংরিজি থেকে তরজমা করে দিয়েছিলাম। মাঝে অনেক কাল "চতুরঙ্গ"-র খবর রাখতে পারি নি। সম্প্রতি যোগাযোগ ঘটেছে আর সম্পাদক মহাশয়ের সাদর নির্বন্ধে লিখতে বসেছি। নানা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও সানন্দে লিখছি, কারণ "চতুরঙ্গ"-র যে কটি সংখ্যা দেখেছি তা রীতিমতো ভালো লেগেছে। প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাগ্রহে পড়তে ইচ্ছা করে এমন পত্রিকা হল "চতুরঙ্গ"। একথা বলা যায় যেসব পত্রিকা বিষয়ে, তাদের সংখ্যা আজ একান্ত বিরল।

আমি পুলকিত বোধ করি যে বাংলাদেশের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে "চতুরঙ্গ" এক সহজ শোভন এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছে। খুবই খুশি হয়েছি দেখে যে আহ্‌মদ্ শরীফ্-এর মতো যে সুদুর্লভ মনস্বী, সাহসিক চিন্তায় যিনি অগ্রণী আর বাঙলা সাহিত্যের জনজীবনসম্পর্ক বিষয়ে যাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রায় তুলনাহীন, তাঁর রচনা সম্প্রতি "চতুরঙ্গ"-এ প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম থেকে সার্ধ-শতাব্দী-পূর্তি উপলক্ষে তাঁর মতো চিন্তাশীল মানুষকে কলকাতার কোনো প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান আহ্বান করে আনার কথা ভেবেছিল কিনা জানি না। "চতুরঙ্গ" অন্তত দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মতো তাঁর একটি রচনা ছাপিয়ে আমার মতো ব্যক্তিকে সুখী করেছে।

বেশকিছু কাল কার্যত কলকাতা থেকে প্রবাসী অবস্থায় ছিলাম বলে কেমন যেন আমার মনে লাগে যে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিম বাঙলার যোগাযোগ কেন আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে না। রাজনৈতিক দিক থেকে বাধা কাটাবার তেমন প্রয়াস উভয়পক্ষ থেকে হয় নি; অর্থনৈতিক যে সম্পর্ক শুধু স্বাভাবিক নয় একান্ত প্রয়োজন, তারও চেষ্টা তেমন হয় নি; আমাদের ভাষা এক, আর 'আ-মরি বাঙলাভাষা' বিষয়ে বাংলাদেশের প্রাণের টান আমাদের চেয়ে যখন ঢের বেশি, তখন অন্তত এক্ষেত্রে সহযোগিতা কেন যে যথেষ্টের থেকে অনেক কম, তা সহজ বুদ্ধিতে আসে না।

কাউকে কটাক্ষ করছি না। কিন্তু আমার মতো অনেকে নিশ্চয় আছেন

যাঁদের মনে একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে এবং তার অব্যবহিত পরে, যে-আশার পিছনে ছিল বাঙালি হিসাবে একটা গর্ব, একটা আনন্দ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে-দুর্বলতা ও গ্লানির ফলস্বরূপ দেশবিভাগের মতো এক যন্ত্রণার ফাঁদে এই উপমহাদেশকে পড়তে হয়েছে, সেই দুর্বলতা ও গ্লানির বোঝা থেকে একটু যেন নিস্তার পেয়েছিলাম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে। ঘটনাচক্রে সে-আশা অনেকটা বিলীন হয়ে পড়েছে; উভয় দেশেই গণ-আন্দোলনের বহু মূলগত দৌর্বল্যের ফলে ভারত তার সমুচিত এবং আকাঙ্ক্ষিত পথে চলতে পারে নি। বাংলাদেশের যে-অভ্যুত্থান আমাদের নির্বীর্য জীবনধনদৈন্যকে অপসৃত করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেখা দিয়েছিল, তা-ও ঝিমিয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের যে-মানুষ তাদের নেতাকে "মুজিব ভাই" বলে ডেকেছিল, তাদেরই আশাভঙ্গের মাশুল আজও তাদের সবাইকে দিতে হচ্ছে। মাঝে-মাঝে দুই বাঙলার সাহিত্য-শিল্পে ব্যাপৃত যারা তাদের সাময়িক একটা মিলনক্ষেত্রে বানানো হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের সার্বভৌম স্বাতন্ত্র্য এবং ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে পশ্চিম বাঙলার অবস্থিতিকে আপাতত অকাট্য জেনেই আমাদের মধ্যে যে সুসম্পর্ক বিবিধ ক্ষেত্রে গড়ে উঠতে পারত, তার লক্ষণ দেখতে পাই না। হয়তো আমার কথায় একটু বাহুল্য রয়েছে। কিন্তু আমার হিসাব একেবারে ভুল প্রমাণিত হলে খুবই খুশি হব।

এতটা একটানা লিখে ফেলে মনে পড়ছে যে সম্পাদক মহাশয় আমাকে জওয়াহরলাল নেহরু সম্বন্ধে কিছু লিখতে বলেছেন, কারণ শীঘ্রই জওয়াহরলালের জন্ম থেকে শতাব্দপূর্তি হতে চলেছে, আর ভারতীয় সংসদ-সদস্য বহুকাল ধরে ছিলাম বলে জওয়াহরলাল বিষয়ে আমার কাছ থেকে জানতে চাওয়া একেবারে অসঙ্গত নয়। আমার মুশকিল হল এই যে, নানা কারণে সংক্ষেপে জওয়াহরলাল বিষয়ে কিছু লিখতে অসুবিধা বোধ করি, যদিও নানা পত্র-পত্রিকায় দুটো ভাষায় লিখবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাও সহজ নয়, আর তা পারছিও না। "চতুরঙ্গ"-এ লিখতে গিয়ে কেবলই মনে আসছে দেশবিভাগের কথা। যে দেশবিভাগ জওয়াহরলালের মতো সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শলেশশূন্য মানুষের পক্ষে ঠেকাবার কাজে সাফল্য সম্ভব হয় নি। অবশ্য এ-ব্যর্থতার দায়িত্ব দেশের সকলের—গান্ধী থেকে শুরু করে বামপন্থী-সমেত আমাদের সকলের। মুসলিম লীগ আর জিন্নার নিন্দা আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতিকে শুধু আক্রমণ করে কে তুষ্টি পায় জানি না, কিন্তু আমাদের গোটা দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনেই ছিল এমন গলদ যাতে দেশবিভাগের কলঙ্কিত মূল্যের প্রতিদানে "ক্ষমতার হস্তান্তর" ঘটল ব্রিটেনের কাছ থেকে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুই রাষ্ট্রে।

১৯৩০ সালে লনডনে প্রথম গোলটেবিল সম্মেলনে মওলানা মুহম্মদ আলি একক ভূমিকায় উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন অনেক দুঃখে—'We divide and you rule'। ইংরেজ "divide and rule" করছে বলে পার পাওয়া যায় না, নিজের ক্লৈব্যকে ঢাকা যায় না। সারাদেশের সবাই মিলে চাইলে মনস্কামনাপূরণে বাধা দেয় কে? 'এ আমার, এ তোমার পাপ'—মনে পড়ে যায় সেদিনের কথা ভাবতে গেলে। গান্ধী অন্তত কিছুতেই দেশবিভাগকে মেনে নিতে পারেন নি; শেষদিকে এমনও বলেছিলেন যে পারে যদি কেউ তো "বিপ্লব" ঘটাবার চেষ্টা হোক। কিন্তু তিনি ক্লান্ত, সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে আর কিছু করার। এমনও বলেছিলেন যে জিন্নাকেই দেশের কর্তার পদে বসানো হোক, বিবদমান পক্ষের দশজন করে প্রতিনিধি একটি কুটিরে একসঙ্গে বসে সমঝোতার চেষ্টা করুন। এ অবশ্য নৈরাশ্যেরই কথা, কিন্তু নেহরুর মতো লোক কেন সর্দার পটেলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মানলেন দেশবিভাগকে? তখন দেশ জুড়ে যে অশান্তি আর হানাহানি, অমানুষিকতার যে বিভীষিকা চলছিল,

তাতে পরযুদস্ত বোধ করে কেন হার মানলেন—'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধংত্যজতি পণ্ডিতঃ'—চাণক্যের এই কূটবুদ্ধি কেন আমাদের দেশাভিমানকে পরাস্ত করল? জওয়াহরলালের নামে কেউ সাম্প্রদায়িকতার নালিশ আনবে না, কিন্তু কেন আত্মজীবনীতে যে-সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে তিনি লেখেন যে দেশের বিপদ কম্যুনিজম থেকে নয় বরঞ্চ শব্দটি একটু বদলে কম্যুনালিজম থেকে, জাতীয় জীবন থেকে সেই বিষোৎপাটনে তাঁর ব্যর্থতা কেন দেখা গেল?

হয়তো অবান্তর মনে হবে, কিন্তু মস্কোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত কে. পি. এস. মেনন যখন ১৯৫৩ মার্চে স্টালিনের মৃত্যুর কিছু পূর্বে দেখা করেন, তখন স্টালিন বলেছিলেন যে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র ব্যাপারটা "আদিম" (primitive) বটে, কিন্তু ভারতের কি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে আলগাধরনের হলেও পাকিস্তানকে নিয়ে সংযুক্তরাষ্ট্র গঠন বিষয়ে? এদিকে এদেশের চিন্তা একেবারে এগোয় নি। গান্ধী বেঁচে থাকলে কিংবা জওয়াহরলাল সংকোচবিহ্বলতা পরিহার করে এবং ক্ষুদ্রচেতা সহযোগীদের আপত্তি অতিক্রম করার সাহস এবং কৌশল দেখাতে পারলে হয়তো একেবারে অসম্ভব ছিল না এদিকে কিছুটা অগ্রসর হওয়া। জানি পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল, আর পশ্চিমী নয়া-সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ছিল অপরিসীম আর কৌশল ছিল অফুরন্ত। পাকিস্তানকে পরিকল্পিতভাবেই একটা 'টাইম বোমা' হিসাবে পোঁতা হয়েছিল যাতে দরকার পড়লেই তাকে কাজে লাগানো যায় ভারতের বিপক্ষে। দক্ষিণ এশিয়াতে ভারতরাষ্ট্রকে নিয়েই নয়া-সাম্রাজ্যবাদের যা কিছু দুশ্চিন্তা। কারণ বাকি দেশগুলোকে মোটামুটি কবজা করে রাখা পশ্চিমের সমরশক্তি ও ধনৈশ্বর্যের পক্ষে ছিল সহজ। এরই মধ্যে হাজার মুশকিলের মোকাবিলা করে চলা ভারতের সাধ্যে ঠিক যে কুলায় নি, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আর সেজন্যই জওয়াহরলালকে দায়ী খাড়া করা উচিতও হবে না। কিন্তু দুঃখ তো হয় যে কিছুতেই এই উপমহাদেশে বহু ব্যবধান বৈচিত্র্য ও বিবাদসম্ভাবনা সত্ত্বেও সংহতি না হলেও নৈকট্য, আত্মীয়তা না হলেও পরস্পরস্বার্থেই বৈরিতাবর্জন একটা অসাধ্য ঘটনা ছিল না।

আজও যে পাকিস্তান দূরে থাক, বাংলাদেশের সঙ্গেও সুসম্পর্ক ব্যাপারে রাজনীতিমহলে কোথাও কোনো শিরঃপীড়া নেই, তা জানতে দেরি হয় না। নানাদিক থেকে আমাদের অবনতিই যে ঘটে চলেছে। সতেজ সচেতন সমাজবাদী-সাম্যবাদী মনোবৃত্তি দূরে থাক, গান্ধী-জওয়াহরলাল প্রমুখের চিন্তাও বহুবিধ মধ্যযুগীয়তায় আচ্ছন্ন। তা নইলে স্বাধীনতার চল্লিশ বৎসরেরও বেশি কেটে যাওয়ার পরও সাম্প্রদায়িক অমানুষিকতা ঘটতে থাকে প্রায় অবলীলাক্রমে, হিন্দু-সমাজেই যারা দলিত তাদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়ে বই কমে না, বাবরি মস্‌জেদ-রামজন্মভূমি নিয়ে মূর্খের কাজিয়ার মতো কেলেঙ্কারির সুরাহা হয় না, শিবসেনা আর বিশ্বহিন্দুপরিষদ আর তুলনীয় মুসলিম জমায়েৎ নোংরা রাজনীতির বাজার জমিয়ে রাখে?

অনেক সময় ভাবি, যদি মুসলমান ঘরে জন্মাতাম বা দলিত "অস্পৃশ্য" পরিবারে, তা হলে আমার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জীবনটাকে কেমনভাবে দেখতাম? গান্ধী একবার বলেছিলেন যে, কোনো প্রস্তাব নিয়ে মনস্থির করার আগে ভাবা উচিত সেই মানুষটির কথা, যে হল সবচেয়ে বঞ্চিত আর তার কোনো উপকার ঘটছে কি না তা যাচাই করা। এজন্যই ১৯২৮ সালে গান্ধী একবার তখন প্রায়-সোসালিস্ট জওয়াহরলালকে লেখেন: 'আমি তোমারই মতো মনে করি যে ধনী আর বাক্যবাগীশ শিক্ষিত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে লড়াই হল দরকার কিন্তু তার উপযুক্ত সময় আসে নি।' উভয়ের হিসেবে সে-সময় কখনও যে এল না, এটা দেশের দুর্গতির একটা কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু চাইলেই যে মনোমত সামাজিক পরিবেশ আর বিপ্লবসম্ভাবনা পাওয়া যাবে,

তা নয়। এদিক থেকেই জওয়াহরলাল এবং সর্ববিধ বামপন্থী-সমেত আমাদের যে ব্যর্থতা প্রকট, তা জওয়াহরলালের কথা ভেবে কেবল মনে আসে।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে মুসলিম জনতা যোগ দিয়েছিলেন যে-উদ্দীপনা নিয়ে, তা আমাদের মতো কেউ-কেউ কিছুটা চাক্ষুষ করেছি এবং কখনও ভুলতে পারব না। আন্দোলনে যখন ভাঁটা পড়ে গেছে, তখনই ১৯২৩ সালে "বেঙ্গল প্যাক্ট"-এর মাধ্যমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বাঙালি মুসলমানের চিত্তজয় করেন, স্বরাজ্য পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ঘটান। কিন্তু কংগ্রেসের তৎকালীন সর্বভারতীয় নেতৃত্ব তাতে বাধা দেয়, গোটা দেশে তার প্রভাব ছড়ানো যায় নি। ক্রমশ বাঙলা-পনজাবের মতো মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিতে স্বাধীনতাপ্রয়াস থেকে মুসলিম জনতার দূরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, চাষীর স্বার্থবিরোধী আইন প্রণয়নে কংগ্রেসিদের সহায়তা এই দূরত্বকে ঘনীভূত করতে থাকে। ১৯২৬ সালে ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাকালে দুই প্রধান ছিলেন মওলানা হসরৎ মোহানি আর মওলানা আজাদ সুভানি। অবশ্য বেশিদিন টিকতে পারেন নি, কিন্তু তা হল ভিন্ন প্রসঙ্গ। একদা-উপহসিত যে-ধারণা ১৯৪০ সালে পাকিস্তান রূপ পরিগ্রহ করে ভারতরাজনীতিতে ভূমিকম্প ঘটাল, তার মোকাবিলায় মুসলিমদের মধ্য থেকেই অগণিত মানুষকে টেনে আনার সম্ভাবনাকে অনেকটা হেলায় হারিয়ে ফেলা যে হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সময় সর্বদল-সম্মেলনে দেখা গেল, হিন্দু-মুসলিম বিতর্ক প্রধানত চারটি বিষয় নিয়ে। (১) সিন্ধুপ্রদেশের স্বাতন্ত্র্য; (২) বাঙলা ও পনজাবে মুসলিম সংখ্যাপ্রাধান্য আইন সভায় স্থায়িভাবে স্বীকৃতি; (৩) কেন্দ্রশাসন-ব্যবস্থায় শতকরা ৩৩ ভাগ মুসলিম আসন নির্দেশ; (৪) স্বাধীন ভারতের সংবিধানে লিপিবদ্ধ নয় এমন ক্ষমতা ('residuary powers') কেন্দ্রের পরিবর্তে রাজ্যগুলিকে অর্পণ। এখন মনে হয়, এ তো সামান্য বস্তু যা নিয়ে ঝগড়া মেটানো সহজ, কিন্তু তা মেটে নি। মুহম্মদ আলি বিরক্ত হয়ে বলেন, 'ইংরেজের সঙ্গে তোমরা মিটমাট করছ। পূর্ণ স্বাধীনতার বদলে 'ডোমিনিয়ন'-এর মর্যাদায় তুষ্ট হচ্ছ। আর মুসলমানকে শতকরা ৩৩-এর বদলে ২৫ করতে চাইছ। তোমরা ইহুদি, তোমরা বেনিয়া।' আশ্চর্য হতে হয় কত তুচ্ছ কারণে—যেমন জিন্নার ১৪ কিংবা ১১ 'পয়েন্ট' নিয়ে বিতর্কে বিবাদ মিটানো সম্ভব হয় নি। গান্ধী একবার বললেন, স্বদেশী কালিকলম নিয়ে সাদা 'চেক' দিতে তিনি তৈরি—অভাবতই রুষ্ট হয়ে জিন্না বললেন, এসব রহস্যে তিনি নেই! ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পর যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় দুজন লীগনেতাকে নিলে ঝগড়া না পেকে মিটবার সম্ভাবনা ছিল বলেছেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ-এর মতো বিরাট পুরুষ। কথাটা নিয়ে অনেক বিতণ্ডা ঘটেছে, স্থির সিদ্ধান্ত এখনও কঠিন। কিন্তু সন্দেহ তো নেই যে নেহরু-সমেত কংগ্রেস নেতৃত্ব এমন বহু সুযোগ স্রেফ অবজ্ঞার ফলে নষ্ট করেছেন।

১৯৩৮ নাগাদ সময় কাশীতে ভারতমাতামন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। গান্ধী উদ্বোধন করেন। ছবি দেখেছি কাগজে সীমান্ত গান্ধী একটু যেন অস্বস্তি নিয়েই উদ্বোধনে উপবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। পরে স্বচক্ষে দেখেছি যে যদিও মন্দিরে ভারতমাতার কোনো মূর্তির বদলে দেশের মানচিত্র আছে, সঙ্গে-সঙ্গে দেশের সবকটি প্রচলিত ভাষার লিপি খোদিত রয়েছে। বাদ শুধু উর্দু। কারণ জানতে গিয়ে শুনলাম যে, উর্দুর হরফ বিদেশ থেকে এসেছে বলে তা বরবাদ। ব্যাপারটি অত সোজা মানতে পারি না। ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী থেকে শুরু করে কোন্ লিপির উদ্ভব কোথায়, তা নিয়ে বিদ্বানেরা বিতর্ক করুন। কিন্তু উর্দু তো মুসলমান আর হিন্দুর উভয়ের হাতে আর মুখে গড়া একটা ভাষা যা বিশেষ কারণে মুসলমানের কাছে প্রিয়। মুসলমান নই, কিন্তু আমারও বুকে ধক করে ঘা লেগেছিল এই কাণ্ড দেখে। ভাবলাম গান্ধী জওয়াহরলাল প্রমুখ সবাই কেমন করে এ-কাজে সায় দিলেন। অথচ ঠিক তখনই মুসলিম লীগ প্রচার করছিল যে রাজ্যে-রাজ্যে কংগ্রেসি শাসনে মুসলমানকে প্রপীড়িত করা হচ্ছে—বন্দেমাতরম্ গাওয়া হচ্ছে সব স্কুলে। কংগ্রেসের নিশান উড়ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ যেন সুপরিকল্পিত কায়দায় মুসলমান মানসিকতাকে আঘাত দেওয়ার একটা আয়োজন।

পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত (১৯৪০) হওয়ার আগেই জওয়াহরলাল একবার নিজের দল নিয়ে গর্ব আর আস্থার প্রাবল্যে বলে বসলেন যে দেশে আছে মাত্র দুটো পক্ষ। কংগ্রেস লড়ছে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে। তাই বাকি যারা আছে (লীগ ও অন্যান্য) মনস্থির করুক কোন্ পক্ষে তারা ভিড়বে! কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় জওয়াহরলালের ছিল (পূর্বে তাঁর পিতা মোতিলালের মতোই) এক অদ্ভুত অনীহা। ১৯৪২ সালে যখন মুশকিল আরও ঘনিয়ে উঠেছে তখন কংগ্রেসের প্রতিভূ না হয়েও রাজাগোপালাচারির মতো বিচক্ষণ মানুষ কংগ্রেস-লীগ মিলনের যে সূত্র দিয়েছিলেন, তাতে মুসলিম মহলে রীতিমতো অনুকূল আবহাওয়া দেখা গিয়েছিল। কিন্তু হয়তো এজন্যই দেখা গেল ১৯৪৪ সালে রোজনামচায় লেখা জওয়াহরলালের মন্তব্য: 'রাজাগোপালাচারির মতো বিপজ্জনক মানুষ আজ আর কেউ আছে?' অবশ্য হঠাৎ-বলা কথা থেকে সিদ্ধান্ত অনুচিত; নেহরুই তো রাজাজীকে বড়োলাট বানাতে কুণ্ঠিত হন নি পরে। কিন্তু কংগ্রেস-লীগ সমঝোতার সম্ভাবনা যাঁরাই তখন বাড়াতে চেষ্টা করেন—যেমন ভুলাভাই দেসাই—তাঁরাই নিন্দিত হয়েছেন, বিপন্ন হয়েছেন। শোনা তো গিয়েছিল যে গান্ধীর সম্মতি নিয়েই দেসাই এবং লিয়াকৎ আলি খান-এর অনেকটা মিটমাটের দিকে এগোবার সম্ভাবনা ছিল। সবকিছু ভেস্তে যাবার ফলে যে-নৈরাশ্য তাই ভুলাভাইয়ের আকস্মিক হৃদ্‌যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে পড়ার একটি কারণ বলে শোনা গিয়েছিল।

জওয়াহরলাল ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বহু ঊর্ধ্বে। সর্দার পটেল তো ঠাট্টা করে বলতেন যে "কংগ্রেস মুসলিম" একমাত্র হলেন নেহরু! স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে যে বীভৎস হানাহানি অমানুষিকতার পর্যায়ে চলে যায়, তাকে প্রতিহত করতে জওয়াহরলালের অসমসাহসী মনোভাব তাঁর চারিত্র্যেরই প্রকাশ। দেশের দুর্ভাগ্য যে তাঁর মতো অমিতপ্রতিভা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানপ্রয়াসে যথাসময়ে এবং যথোপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হল না। শুধু জওয়াহরলালকে দোষী সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ বাতুলতা, কিন্তু দুঃখ হয় বই কি যে দেশের ক্লেদাচ্ছন্ন পরিস্থিতির কাছে তাঁকে হার মানতে হল। চিন্তাশক্তির প্রসার এবং অপরের মনের বেদনা বুঝবার মতো হৃদয়বত্তা সত্ত্বেও এবং একটা মূল সমস্যার সামাজিক শিকড় আর তাকে উৎপাটিত করার উপায় সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হলেও তিনিই পরিস্থিতির চাপে পরাস্ত হলেন। মনে পড়ছে, হঠাৎ জওয়াহরলালের চিতাপার্শ্বে শিশুর মতো কেঁদে-ছিলেন কাশ্মীরনায়ক শেখ আবদুল্লা। আবুল কালাম আজাদের মতো স্থিতধী কেন যে আজীবন সহযোগী আর সঙ্গে-সঙ্গে পরম বন্ধুর বিভ্রম বিষয়ে নীরব থাকতে পারেন নি, তা বোঝার চেষ্টা প্রয়োজন।

হলফ করে বলা যায় না, কিন্তু ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় হঠাৎ কয়েকদিন হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ জওয়াহরলালকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে অল ইনডিয়া কংগ্রেস কমিটির ভুবনেশ্বর অধিবেশনে বলতে গিয়ে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার এটাও সম্ভবত ছিল একটা কারণ। তখনকার কথা বিশেষ করে মনে আছে, কারণ লোকসভায় বলে ফেলেছিলাম মনের দুঃখে যে, ক-টা দিন কলকাতা যেন ছিল 'নরকেরই আর-এক নাম' ('euphemism for hell'), যা বুঝি পাকিস্তান রেডিও ফলাও করে প্রচার করার ফলে আর কলকাতার এক কাগজে দেখি যে আইয়ুব খান আর

আমার 'কুশপুত্তলিকা' দাহ করা হয় এক সভাতে। এই সময়টাতেই জওয়াহরলাল কেবলই বলতেন যে কত কাজ বাকি রয়ে গেল, তাড়াহুড়ো করতেই হবে, অনেক প্রতিশ্রুতিই যে পালন করতে হবে আর বড়দুর যাওয়া রইল বাকি।

দীর্ঘকাল রাজনীতি করেছেন জওয়াহরলাল। আর আদর্শ এবং নিষ্ঠা বিষয়ে যতই যত্নবান থাকুন না কেন, তার কলুষ মাঝে-মাঝে স্পর্শ তো তাঁকে করত-ই। এখানে খুঁটিনাটি খবরের উল্লেখ প্রয়োজন নয়—তবু মনে পড়ে যাচ্ছে, ১৯৫৯-৬১ সালের কেরালা সরকারকে (যা ছিল ইতিহাসে প্রথম ভোটে নির্বাচিত কম্যুনিস্ট সরকার) অন্যায় উপায়ে ফেলে দেবার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা মার্জনীয় নয়। একটু যেন লজ্জাবোধ করে, তখন নিজেকে পিছনে রেখেছিলেন। গোবিন্দবল্লভ পন্ত ছিলেন সংসদে এই কম্যুনিস্ট-নিধন অভিযানের সেনাপতি। কিন্তু দায়িত্ব যে মূলত তাঁরই, এটা অস্বীকার করা যায় না। নিজেই মাঝে-মাঝে বলেছেন যে যাদের সঙ্গে রাজনীতি করছেন তাদের নীতির তেমন বালাই নেই—বিরোধী দলে থাকলে আমি নিজেই আমার সরকারের বিরোধিতা করতাম—এমন কথাও বলেছেন, দেশবাসীর কাছে, মার্জনা চাইতেও কুণ্ঠিত হন নি। আমাকে একবার লেখেন, যে তিনি যে-সংস্থায় রয়েছেন তাকে ছেড়ে কিংবা তারই মধ্যে ভারতীয় কায়দায় নিজস্ব 'সম্প্রদায়' গঠন করবেন কেন, যখন তাতেই যে সুফল ঘটবে তার নিশ্চিতি নেই। একবার ১৯৫৯ সালে লেখেন যে জয়প্রকাশনারায়ণকে তিনি পছন্দ করেন। জয়প্রকাশও শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু কেমন করে তিনি জয়প্রকাশকে সহযোগী করে নেবেন, যখন তাঁর আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ নীতি জয়প্রকাশের কাছে একেবারে অগ্রাহ্য। কিছুটা আন্দাজ পাই তাঁর মনের, যখন একাধিকবার আমাকে বলেছেন এবং লিখেছেন যে আমার মতো 'sensitive' ('স্পর্শ-কাতর' ঠিক এর তরজমা নয়) ব্যক্তির জীবনে রাজনীতি-সংসর্গ বহুবিধ যন্ত্রণারই কারণ হবে। নেহাত ভুল বলেছিলেন মনে হয় না।

অসামান্য শক্তিধর হয়েও সেই অসামান্য শক্তি কঠোরভাবে ব্যবহার করে দেশের চেহারা বদলে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। হয়তো বা প্রবৃত্তিও ছিল না। "আত্মজীবনী"তে একটা ঘটনার কথা রয়েছে—শিকারে গেছেন একবার, কিন্তু যখন আহত এক হরিণশিশু ছুটে এসে পড়ল পায়ের কাছে আর তার চোখ বেয়ে জল, তখন শিকারের বাসনা চিরতরে অন্তর্হিত হল। এহেন ব্যক্তি বিপ্লবের মূল্য দিয়ে, দেশবাসীর বিপুল দুঃখকষ্টের বিনিময়ে সমাজপরিবর্তনে কেমন করে প্রস্তুত হতে পারেন? যে-সংসদীয় ব্যবস্থায় অজস্র গলদ রয়েছে বলে তার ব্যাপক পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন স্বীকার করেও সে-কাজে নামবার সংকল্পেও তিনি অটল হতে পারলেন না। ইতিহাসের কাছে জওয়াহরলালের ঋণ রয়ে গেল। কিন্তু আমাদের মতো যারা নিকট থেকে তাঁকে জেনেছি, তারা সহজে তাঁর সম্বন্ধে কঠোর হতে পারি না। তা ছাড়া, দেশ এবং আমাদের গোটা যুগ তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছে, তারও পরিমাণ এবং গুণ তো একেবারেই সামান্য নয়। তাঁর মৃত্যুকালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভায় মরক্কো-র প্রতিনিধি যা বলেন, তা মনে পড়ে যাচ্ছে: 'জওয়াহরলাল ছিলেন জগতের যে-ভূখণ্ডে আমরা বাস করি তাদের সর্ববিধ সুনীতির স্থপতি'।

'স্বদেশে প্রবাসী'-অনুভূতি নিয়ে যাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ, তিনিই আবিষ্কার করলেন ভারতবর্ষ এবং তার মানুষের সঙ্গে পরিপূর্ণ সহমর্মিতা। শুধু ভারতবর্ষ নয়, সর্বদেশের মানুষের মুক্তি, শোষণরহিত সমসুযোগের সমাজ স্থাপন, সবাই মিলে নবযুগ নির্মাণের কাজে লিপ্ত থাকা, এই ছিল যাঁর কাম্য, তাঁকে শুধু এদেশ নয়, ইতিহাস সহজে ভুলবে না। মৃত্যুকালে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জাকির হুসাইন যাঁকে 'হিন্দোস্তান-কে-মেহ্‌বুব' ('দেশের দুলাল') বলে অভিহিত করেছিলেন, আজ তাঁর স্মৃতি ম্লান হয়ে এলেও বহুকাল ধরে মানুষের মন থেকে তা বিলীন হয়ে যাবে না।

এরিয়েল

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই কি আমার গান? না কি এও সেই
জাহাজডুবির পরে যে-বছর তারা
আশ্রয় করেছে দ্বীপ, বনশূঙ্খলেই
যারা চিনেছে নিজের আত্মা, সেই যারা
একবার সমুদ্রঘণ্টার শব্দ শুনে
বুঝেছিল ডুবোপাহাড়ের ঘাই আছে
সামনে, আর যে-নৌকার মাল্লা সব খুনে,
সীমানা পেরিয়ে কিছু দস্যুতার আঁচে
ভাসমান দড়ি কেটে আগুন পোহায়—
এই কি তাদের গান—হাড়ের গুঞ্জন?
না কি আমারই শরীর থেকে ত্রিস্রোতায়
সে-গান মিশেছে! আমি কী ক'রে নির্জন
তার নিজের গভীরে এনে বলে যাব—'আছে,
তোমার সমস্ত গান এরিয়েল, আছে!'

দৈত্য মরলে

বেলাল মোহাম্মদ

দাদি বুড়ি ভূরি-ভূরি গপ্পো বলেন
মিথ্যামিথ্যি—
দৈত্য মরলে রক্তফোঁটায় দৈত্য গজায়
লক্ষ কোটি।
দাদি বুড়ি গপ্পো বলেন ভয়াল ভয়াল,
গা ছমছম চমকে উঠি।
রাজার গপ্পো,
প্রজার গপ্পো,
দৈত্যদানোপরীর গপ্পো—
শেষ হলেও রেশ কাটে না,
ঘুমের চোখে ঘুম আসে না,
এমন ভয়াল আজব গপ্পো।
রাজার মনে হাজার খেয়াল
যেমন ইচ্ছা শাসন চালান
কথায় কথায় বেজায় দাপট
প্রজার সামান লোপাট করেন।
এক সময়ে প্রজার ঘরে
জন্মাল এক দৈত্য ছেলে—
হাঁক ছেড়ে সে দাঁড়িয়ে গেল
টান করে বুক,
তাই তো দেখি, এমন সাহস।
তেড়ে এল রাজার সৈন্য—
পেছন থেকে মারল ছুরি—
বইয়ে দিল রক্তগঙ্গা।
কিন্তু এ কী, দৈত্য ছেলের
ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত থেকে
গজিয়ে গেল হাজার দৈত্য—
ওরা এখন রাজার আসন
করবে ঘেরাও।
কী যে বলেন দাদি বুড়ি
মিথ্যামিথ্যি।
রাজার গপ্পো, প্রজার গপ্পো
দৈত্যদানোর আজব গপ্পো,—
হোক সে যতোই মজার গপ্পো,

চতুরঙ্গ নভেম্বর ১৯৮৮

এ কথনো সত্য কি হয়?

হতেই পারে, এই যে-রকম
বীজের থেকে বৃক্ষ গজায়,
ধ্বনির থেকে প্রতিধ্বনি—
বেনজামিনের মরণ থেকে
লক্ষকণ্ঠ কবির জন্ম॥*

বাংলাদেশ

* কবি-শহীদ বেনজামিন মলোইশ। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের বিচারে এই কবির ফাঁসি হয়।

একান্তে

পরিমল চক্রবর্তী

বুড়ো বটগাছটার স্বদেশী ছায়ার নীচে
অন্তহীনতার রহস্য নিয়ে সাদা এক নদী
একলা বইছে, বইছে কালো বাতাস ;
হৃদয়তা তার সর্বাঙ্গে—রোদের স্নেহের মতো।
কার ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর শুনে-শুনে
স্মৃতি দীর্ঘপথ পেরিয়ে এসে
হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তার প্রত্যাশার সর্বস্বতা নিয়ে ?
আর, বটগাছটার পাতায়-পাতায়
একটানা গভীর মর্মর
করুণায় প্রতিমূর্ত যেন।
আর, অন্যদিকে এক চিরকিশোরের
রূপমগ্ন দুটি শান্ত অপরূপ চোখ
ওই বুড়ো বটগাছটার নিবিড় ছায়াকে ভালোবেসে
সব-কিছু ভুলে গেছে ;
তাই পড়ে আছে নদীকূলে,
পড়ে আছে একান্তে॥···

সাক্ষাৎকার

কিরণশঙ্কর রায়

চোখের তারায় চুপ করে আছে আষাঢ়ের দিন
সাক্ষাৎকারে আজো কি নবীন
দেখব তোমাকে এবং তোমার স্বভাবতরুণী কিছু ডালপালা ?

আমি শুধু ভাবি মাটি থেকে বীজ এই যে নিরালা
উড়িয়ে এনেছে একজোড়া মেঘ,
জলের সহজ শব্দে কি তার
পেছনের সব বিদ্যুৎ-সাঁকো উড়িয়ে যাবার
কথা রেখে যাবে—
তাকে কি দেখাবে
স্বর্গ-পাতাল-ভেদ-করা ভুরু, ভ্রূ-মণ্ডলের গূঢ় উদ্বেগ
অথবা শেখাবে জলের স্খলন, সহজ স্খলন বা এক গভীর
সুখে হাওয়ার মুঠো খুলে-খুলে ধীরে নেমে আসা,
পাতার মতন—আমি শুধু ভাবি আমাদের সেই ভাগ্যের পাশা
পাতবে কি আজো জলের শব্দ, শরীরে বিজন নদীর দুতীর ?

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক-আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

৬.৬

নীলকর-সাহেব-বিরোধী কোনো ফরাজি আন্দোলনও নীলচাষপ্রথার বিরুদ্ধে আগের বা পরের আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। যেখানে নীল-প্রতিরোধ আন্দোলন ব্যাপকভাবে হয় নি (যেমন ১৮৫৯-৬০ সালে হয়েছিল), সেখানেও এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন—চাষীরা একজোট হয়ে নীলকরের দাদন নেয় নি; নিলেও অত্যন্ত অযত্নে, অবহেলায় নীলচাষ করেছে; কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বোনা নীলকে গোপনে উপড়ে ফেলে দিয়েছে; নীলকরের লোকেরা জোর করে নীল বুনতে গেলে চাষীরা তাদের বাধা দিয়েছে; নীলকুঠির দিশী আমলাদের নানাভাবে হেনস্তা করেছে এবং উত্তেজনা চরমে পৌঁছলে নীলকুঠিও পুড়িয়ে দিয়েছে। ১৮৪০-এর দশকে বিদ্রোহী ফরাজিদের কর্মসূচিতে এসব বড়ো একটা দেখা যায় না। কারণ, নীলচাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল, কোনো-কোনো নীলকরসাহেব বা তাদের প্রভাবশালী আমলা, গোমস্তা, যারা ফরাজিদের নানাভাবে উত্যক্ত করেছে, তাদের জব্দ করা। কাঙ্গিলালের মতো আমলাকে তারা নির্মমভাবে খুনও করেছে।

ফরাজিদের প্রধান নীলকর-শত্রু জঁ দরেল ডানলপ সাহেবের সঙ্গে তাদের দীর্ঘকালস্থায়ী বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

দুদু মিঞার বিচারের সময় (১৮৪৭-৪৮) ডানলপের সাক্ষ্য (৩রা অগস্ট, ১৮৪৭) থেকেই এ কারণ অনুমান করা যায়। ডানলপ বলে—প্রায় ন বছর আগে দুদু এবং ফরাজিদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সে ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নানা খবর যোগায়। 'সে সময় থেকেই তারা আমার উপর কড়া নজর রেখেছে'।[৭৯] তা ছাড়া দুদুর নানা 'উৎপীড়ন' বন্ধের চেষ্টাও সে মাঝে-মধ্যে করেছে। দুদুর সঙ্গে তার তিক্ত সম্পর্কের আর-একটা বিশেষ কারণও সে উল্লেখ করে: 'আমি কোনোদিন তাকে আমার সমান মনে করি নি; আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে আমি কখনও তাকে চেয়ারে বসতে বলি নি; আমার মনে হয়, এসব কারণে সে আমার উপর তিক্ত-বিরক্ত হয়'।[৮০]

নীলচাষ নিয়ে কি এমন কিছু ঘটেছিল, যার জন্য এ সংঘর্ষ? ডানলপের উত্তর: 'নীলের ফসল তোলার সময় গত বছর নানা সময় দুদু আমার লোককে বাধা দেয়'।[৮১] ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাই সে সাহায্য চায়। এ প্রসঙ্গে তার সর্বশেষ মন্তব্য: 'এর বেশি অন্য কিছু আমি মনে করতে পারছি না'।

তাহলে এ সংঘর্ষের কারণ কী? ডানলপ আর তার লোকদের সাক্ষ্য থেকেই বোঝা যায়, এটা মূলত দুই প্রবল গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। দুদুর ক্রমবর্ধমান প্রভাব জমিদার আর নীলকরদের সমানভাবে বিব্রত করে। সরকারের পক্ষে যে দুদুর বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করে সে এভাবেই ডানলপের তীব্র ফরাজি-বিদ্বেষ ব্যাখ্যা করে। দুদুর কড়া নির্দেশ ছিল, বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তির জন্য ফরাজিরা যেন কোনোরকম আইন-আদালতের আশ্রয় না নেয়; কারণ তার বিচারই চূড়ান্ত। এ বিষয়ে স্থানীয় জমিদারের কাছে কোনো নালিশ সে বরদাস্ত করত না। তার হুকুম অমান্য করার জন্য শাস্তি ছিল কঠোর। সে বলে—দুদু এবং তার বাবা 'এতদিন সার্বভৌম রাজার মতো শিষ্যদের আর্জি ও আবেদনপত্র নিয়েছে; তাদের জরিমানা করেছে; তাদের নানা বিবাদের বিচার ও নিষ্পত্তি করেছে'।[৮২] নিজের এলাকায় ডানলপ এ ধরনের প্রবল প্রতিপক্ষের প্রতাপ সহ্য করে নি। নানা ধরনের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দুদুকে তাই সে বিব্রত করতে চাইল। এক মিথ্যা অভিযোগে দুদুকে গ্রেপ্তারও করা হয়। বিচারের সময় এর তাৎপর্য এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়: 'এতে [দুদু] মিঞা ও তার গোটা শিষ্য-সম্প্রদায়কে হেয় করা হল; প্রকাশ্য এ অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা ঠিক করল, এমন কিছু তারা করবে, যাতে ডানলপ আর 'বাবুরা' ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারবে'।[৮৩]

৬.৭

ফরাজি সংগঠনে ও মানসিকতায় আস্তে-আস্তে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এর মধ্যে দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশরাজবিরোধিতা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে। দুদুর মৃত্যুর (১৮৬২) আগেই এ দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট হয়। সরকারের কাছে এক আর্জিতে[৮৪] দুদু নিজেই তার মনোভাবের কথা জানায়। সে বলে—জমিদার আর নীলকরের বিরুদ্ধেই ফরাজিদের সংগ্রাম; স্থানীয় প্রশাসনের ফরাজিবিরোধী, পক্ষপাতদুষ্ট নানা ব্যবস্থা সত্ত্বেও ব্রিটিশরাজ সম্পর্কে তাদের কোনো বিদ্বেষ নেই। দুদু এমনও বলে, স্থানীয় প্রশাসনে তাকেও কিছু দায়িত্ব দেওয়া হোক। তার উত্তরপুরুষদের যে ইতিহাস মুইনুদ্দীন খাঁ লিখেছেন, তা থেকে ব্রিটিশ রাজের প্রতি তাদের ক্রমবর্ধমান আনুগত্যের প্রমাণ মেলে।

দ্বিতীয়ত, ফরাজিদের ভাবাদর্শে এবং কর্মসূচীতে সাম্প্রদায়িক প্রবণতা ক্রমেই প্রকট হয়ে ওঠে। আমরা আগেই বলেছি, গোড়াকার ফরাজি আন্দোলনে হিন্দু-জমিদার-বিরোধিতা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কোনো বিদ্বেষ থেকে উদ্ভূত নয়। কিন্তু হিন্দুসম্প্রদায় ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে এক ধরনের অসহিষ্ণুতা পরবর্তী কালে বাড়তে থাকে। স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে তাদের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল; কিন্তু সাম্প্রদায়িক চেতনা গোষ্ঠী-চেতনাকে ক্রমেই আচ্ছন্ন করে। যেমন, মুসলমান সমাজে ইসলাম-পরিপন্থী জীবনচর্যার প্রসারের কারণ হিসেবে তারা প্রতিবেশী হিন্দুসমাজের প্রভাবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তারের ফলেও তাদের সম্প্রদায়গত আনুগত্যবোধ বাড়ে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় এ বোধ আরো প্রকট হয়।

৭

ওহাবি-ফরাজি আন্দোলনের মতো ময়মনসিংহ জেলার

শেরপুর অঞ্চলের পাগলপন্থী আন্দোলনও বহুলাংশে এক ধর্মীয়-গোষ্ঠী-নির্দেশিত। এ গোষ্ঠীর উদ্ভবও হয়েছিল আন্দোলনের মাত্র কয়েক দশক আগে। এখানেও আন্দোলনের প্রাথমিক প্রেরণা ছিল ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কার। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তা কৃষকদের প্রতিরোধ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

পাগলপন্থীদের ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার জন্য আমরা কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব : (ক) ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে 'পাগলপন্থা'র প্রভাব কিভাবে বিভিন্ন উপজাতি- ধর্ম ও অন্যান্য গোষ্ঠী-ভুক্ত[৮৫] কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে? (খ) এ আন্দোলন কেমন করে কৃষকদের জমিদার-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়ে? (গ) কিভাবে প্রধানত জমিদারবিরোধী এ আন্দোলন এক বিশেষ সময়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষমতা-লাভের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়? (ঘ) আন্দোলন পরিচালনায় পাগলপন্থী গোষ্ঠীর ভূমিকা কী ছিল?

৭.১

ওই বিশেষ সময়কার পাগলপন্থীদের ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুশাসন, আচার, রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। এ সম্পর্কে একমাত্র সমসাময়িক বিবরণ বিদ্রোহের উপর মরিসন-লিখিত সরকারি প্রতিবেদন।[৮৬] স্পষ্টত, বিদ্রোহীদের সম্পর্কে মরিসনের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য শুধু বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্ত দৃষ্টিই যথেষ্ট নয়; সে সংস্কৃতিভুক্ত মানুষগুলির সম্পর্কে এক গভীর সহমর্মিতাবোধ না থাকলে তাদের বিশ্বাসের অন্তরঙ্গ জগতে পৌঁছনো সম্ভব নয়। রাজপ্রতিনিধি মরিসনের কোনোটাই ছিল না।

তবুও এ বিবরণ থেকে কিছু-কিছু তথ্য আর ইঙ্গিত মেলে। "পাগলপন্থা"র প্রবর্তক এক মুসলমান ফকির—করিম। এর প্রবর্তন বিদ্রোহের মাত্র পাঁচ দশক আগে, প্রধানত ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস হিসেবে। শেরপুর আর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের ধর্মীয় আর নৈতিক জীবনে বিকৃতি আর উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ করে তিনি এ সংস্কারের কাজে ব্রতী হন। তাঁর নূতন ধর্ম এক ধরনের দ্বৈতবাদী ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত; তবে স্থানীয় অধিবাসীদের উপযোগী করে তিনি তাঁর ধর্মাদর্শ প্রচার করেন। কিন্তু তাঁর অনুগামীদের জীবনচর্যা প্রচলিত রীতিনীতি থেকে এতই ভিন্ন ছিল যে, অন্যরা তাদের 'পাগল' বলে ডাকত। স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে তাদের সংহতিবোধের উৎস—প্রীতি এবং সৌভ্রাত্রবোধ; পরস্পরকে তারা 'ভাই' বলে ডাকত; আর গুরুর প্রতি ছিল অবিচল শ্রদ্ধা। করিমের ব্যাপক প্রভাবের দুটি প্রধান কারণ : তাঁর পূতচরিত্র, ধর্মনিষ্ঠা; এবং অলৌকিক ক্ষমতা, 'জাদুবিদ্যা'-কুশলতা। সুসঙ্গ-জমিদার নিজেই তাঁর জমিদারির অন্তর্গত লাটেরকান্দী গ্রামে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেন। শিষ্যদের দানেই করিম পরিবারের ভরণপোষণ চলত।

পুত্র টিপুকেই করিম ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব দেন। প্রধানত তার উদ্যোগেই শিষ্য-সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। সরকারি প্রতিবেদন-মতে, করিমের মৃত্যুর (আনুমানিক ১৮১৩) পর পাগলপন্থা ও সংগঠনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। সংগঠন পরিচালনার ভার পড়ে তাঁর স্ত্রী আর পুত্রের উপর। শিষ্যরা বিশ্বাস করত, গুরুপত্নীও অলৌকিকক্ষমতাসম্পন্না। কিন্তু মরিসনের ধারণায়, টিপুর না ছিল পিতার আদর্শনিষ্ঠা, না ছিল কোনো বিদ্যা-বুদ্ধি[৮৭]; স্থানীয় জনসাধারণের নৈতিক জীবন-শুদ্ধির কোন প্রয়াস তার ছিল না। শুধু তাই নয়, তার জীবনে তাদের 'কুসংস্কারের' প্রভাব বাড়তে থাকে; তাদের অন্ধ বিশ্বাসের তাগিদেই জাদুবিদ্যার নানা কারুকলা দেখানোর দিকে তার প্রবণতা বাড়ে। এভাবেই শিষ্যদের উপর তার বিপুল প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

করিমের প্রতি মরিসন শ্রদ্ধাবান; কিন্তু টিপুর চরিত্রে প্রশংসা করার মতো তিনি কিছুই দেখেন নি।

রাজবিরোধী বিদ্রোহের নেতা টিপুর চরিত্র-চিত্রণে রাজপ্রতিনিধির দৃষ্টিতে আবিলতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাঁর বিবরণের কয়েকটা দিক কিন্তু লক্ষণীয়: যেমন, শেরপুর অঞ্চলে নানা ধর্ম ও উপজাতিগোষ্ঠীর সহাবস্থান; "পাগলপন্থা"র সাম্প্রতিকতা; "পাগলপন্থা"র প্রবর্তক করিম শা'র ফকির হিসেবে পরিচিতি করিম-অনুগামীদের "পাগল" আখ্যা; করিমের বিপুল প্রভাব; এর একটা কারণ হিসেবে করিমের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে শিষ্যদের বিশ্বাসের উল্লেখ, এবং টিপুর আমলে পাগল-সংগঠনে দ্রুত পরিবর্তন।

মুসলমান ফকির হিসেবে করিমের পরিচিতি। কিন্তু ইসলাম ধর্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রূপ কী? স্টিফেন ফুক্স্ পাগলপন্থাকে "ইসলাম পুনরুজ্জীবন" আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন। ওহাবি-ফরাজি আন্দোলনের সঙ্গে এ বৃহত্তর পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের যে প্রত্যক্ষ যোগ, পাগলপন্থার ক্ষেত্রে তা মোটেই ছিল কিনা বলা শক্ত।

এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ওহাবি-ফরাজি গুরুর প্রচার ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল—ভ্রান্ত বিশ্বাস আর আচার থেকে মুসলমানদের ইসলামের আদি অনাবিল ধর্মবিশ্বাসে ফিরিয়ে আনা। পাগলপন্থার প্রচার আর আকর্ষণ মোটেই এ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোক করিমের শিষ্য হয়েছে। বস্তুত পাগলপন্থায় দীক্ষার জন্য কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ছেড়ে আসার প্রয়োজন সম্ভবত ছিল না।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের নির্দেশ করিম সচেতনভাবে লঙ্ঘন না করলেও, তাঁর সাধনপদ্ধতির বিশিষ্ট একটা ধারা ছিল। ইসলামীয় দর্শনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলেও সে ধারা এত ভিন্ন যে এর অনুগামীদের মুসলমান সমাজে স্বতন্ত্র এক গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করা যায়। বস্তুত এ পদ্ধতির এমন কিছু ধর্মীয় এবং সামাজিক তাৎপর্য ছিল, যার জন্য বহুক্ষেত্রে এরা ইসলামবিরোধী বলে নিন্দিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য এই যে, ইসলামের আদি আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী ওহাবি-ফরাজি নেতাদের তীব্রতম সমালোচনার একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল এরা।[৮৮]

সাধনার এ বিশিষ্ট ধারার নাম সুফীবাদ। মরমিয়া সাধনপদ্ধতির এটা একটা রূপ। বিধিবদ্ধ বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের ভূমিকা এখানে একান্তই গৌণ। অন্তরমুখী সাধনার মধ্য দিয়ে সাধক ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করে; এর ফল সাধকের চেতনার সমুন্নতি; তার অস্তিত্বের অণু-পরমাণুতে অনির্বচনীয় আনন্দের প্রকাশ। সাধনপদ্ধতির নানা রূপ—ভক্তি, তন্ময় ধ্যান ইত্যাদি। এ রূপ যাই হোক, সাধনার মূল লক্ষ্য অহং-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিসত্তার বিলোপের মধ্য দিয়ে ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি।

এ উপলব্ধি একান্ত ব্যক্তিগত, অন্তরঙ্গ। বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরতা তাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ সাধনপদ্ধতি গুরুর নির্দেশ ছাড়া সম্ভব নয়। যিনি নিজে ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন, নির্দেশ দেবার অধিকার শুধু তাঁরই। তাঁর নির্দেশেই সাধক সাধনার জটিল ও দুর্গম পথ পেরিয়ে এ বোধের অধিকারী হতে পারে। গুরুর উপর অবিচল আস্থা এ সাধনপদ্ধতির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৮৯] ওহাবি-ফরাজিরা এ গুরুবাদকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে চেয়েছিল। ব্যক্তিসত্তার বিনাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরোপলব্ধি এ সাধনার এক অনিবার্য ফল। জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি বিষয়ে ঔদাসীন্য, বৈরাগ্য; এমন কী সংসারত্যাগ। করিমের 'ফকির' আখ্যার মধ্যে এ বৈরাগ্য আর ত্যাগের ব্যঞ্জনা আছে। ইসলাম ধর্মে কিন্তু সংসার-ত্যাগের বিধান নেই।[৯০]

তাই, মরমিয়া সুফীবাদ ইসলাম-ধর্মতত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে গড়ে উঠলেও এ ধর্মতত্ত্বের অপরিহার্য কোনো অঙ্গ নয়। বস্তুত, অন্যান্য অনেক ধর্মের মধ্যেও এ মরমিয়া সাধনপদ্ধতি বিকাশ লাভ করেছে। সম্ভবত, সুফীসাধনার যে ধারার সঙ্গে করিম শাহ

যুক্ত, তার উপর একটা প্রভাব বাউল-সাধনা। উল্লেখযোগ্য এই যে, বাউলরা "পাগল" নামেও পরিচিত ছিলেন। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ভগবৎ-উপলব্ধির গভীর আনন্দে তাঁরা চেতনার এমন এক স্তরে বিহার করতেন যে, দৈনন্দিন জীবনের অভ্যস্ত রীতিকে তাঁরা একরকম উপেক্ষাই করতেন। করিম-অনুগামীদের 'পাগল' আখ্যার সঙ্গে বাউলদের এ প্রচলিত অ্যাখ্যার যোগ থাকলেও থাকতে পারে। বাউল-সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ দেহতত্ত্বও কি ওই অঞ্চলের সূফীদের প্রভাবিত করেছিল? এ সিদ্ধান্ত গবেষণা-সাপেক্ষ। পাগলপন্থীদের উপর সাম্প্রতিক এক মনোজ্ঞ আলোচনা[২১] থেকে আমরা জানতে পারি, ওখানকার সূফী সাধনায় হিন্দু হঠযোগপদ্ধতির প্রভাব ছিল। অবশ্য বাউল-দেহতত্ত্ব হঠযোগীদের দেহকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন।

বলাই বাহুল্য, করিম শাহের বিপুল প্রভাবের কারণ সূফী সাধনপদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন নয়। সূফী বা বাউল-সাধনার কঠিন পথ যে অনেকের কাছেই আকর্ষণীয় ছিল না, তা ধরেই নেওয়া যায়। টিপুর আমলে পাগলপন্থার জনপ্রিয়তার একটা কারণ, পাগল-সম্প্রদায় জমিদার-বিরোধী আন্দোলনে আস্তে আস্তে যুক্ত হয়ে পড়ছিল। কিন্তু গোড়ার দিকে এ যোগ প্রত্যক্ষ ছিল বলে মনে হয় না।

তাহলে শেরপুরের গ্রামীণ সমাজে করিম কি-ভাবে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন? পুতচরিত্র ধর্মনিষ্ঠ সিদ্ধ ফকির হিসেবে করিমের প্রতি সাধারণ মানুষের গভীর শ্রদ্ধার কথা বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের সময় মরিসন জানতে পেরেছিলেন, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু পাগলপন্থার দ্রুত বিস্তারে করিমের প্রচারিত আদর্শের ভূমিকা সন্দেহাতীত। মরিসন খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন, সাধারণ মানুষের উপযোগী করে করিম নিজের ধর্মাদর্শ প্রচার করেন। কিন্তু সে আদর্শ সম্পর্কে তাঁর প্রতিবেদনে বিশেষ কিছু বলা হয় নি। শুধু প্রীতি আর সৌভ্রাত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্রোহের প্রায় একশ বছর পরে লিখিত এক বইয়ের[২২] ভিত্তিতে করিমের নৈতিক আদর্শ এবং সামাজিক দর্শন নিয়ে সম্প্রতি এক আলোচনা[২৩] হয়েছে। বিদ্রোহ শুরু হবার আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে করিমের প্রচারের যথাযথ বিবরণের জন্য এ বই নির্ভরযোগ্য কি-না, তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে[২৪]। তবুও লেখক পাগলপন্থী বলে, এবং নানা ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে পাগল-পন্থার আদি রূপ জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল বলে, তাঁর বিবরণ আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি।

নৈতিক বিধানগুলি[২৫] সহজ, সরল। ইন্দ্রিয়-সংযম, সত্যবাদিতা, ক্রোধজয়, পরনিন্দাপরিহার—লেখকের মতে পাগলগুরু এসব চারিত্রিক গুণের উপর বিশেষ জোর দিতেন। কতগুলি বিধান সম্ভবত স্বল্পসংখ্যক অনুগামীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল, যেমন কঠোর শৃঙ্খলায় রোজা পালন করা। 'পাগলরা দিন ও রাত ধরেই উপবাস করত। সন্ধ্যার পরে রোজার মত উপবাস ভাঙত না।' সবার পক্ষে এ নিয়ম মানা অসম্ভব ছিল। করিমের সামাজিক দর্শনও ছিল সহজবোধ্য, যেমন ঋণের জন্য সুদ দাবি না করা, পণ না নেওয়া, ভগবান ছাড়া কারো অধীনতা স্বীকার না করা, ভগবানের রাজ্যে কাকেও 'সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা' ইত্যাদি। প্রেম আর ভ্রাতৃত্ব-বোধের আদর্শ আগেই উল্লেখ করেছি।

এ সামাজিক দর্শনে মৌলিকত্ব হয়তো বিশেষ ছিল না; কিন্তু জমিদারি-অপশাসন-ক্লিষ্ট কৃষককুলের কাছে এ প্রচারের মূল্য ছিল অপরিসীম। বিশেষ করে এ প্রচার একেবারে সাম্প্রতিক। বিশেষ এক পরিবেশে, বিশেষ এক ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় অতি পরিচিত কথাও প্রাণময়, গভীর-অর্থবহ হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে করিমের ব্যাপক প্রভাবের একটা প্রধান কারণ, তাঁর আদর্শ ও বাণী কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল

না। আগেই বলেছি, ইসলাম ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে এর কোনো অসংগতি ছিল না; কিন্তু এমন নয় যে, অন্য কোনো ধর্মীয় দর্শনের সঙ্গে এর অসংগতি ছিল। ওহাবি-ফরাজি গুরুরা চেয়েছিলেন, তাঁদের অনুগামীরা সত্যিকারের ইসলামপন্থী হবে। করিমের প্রচারে এ ধরনের সম্প্রদায়গত কোনো ঝোঁক ছিল না। অন্তত কিছু-কিছু ক্ষেত্রে ওহাবি-ফরাজিরা জোর করে নিজেদের মত চাপাতে চেষ্টা করেছে। ভিন্ন ধর্মমত এবং আচার সম্পর্কে করিমের ঔদার্য অনেক বেশি। সেজন্য বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর কৃষকের কাছে করিমের আদর্শের একটা সহজ আকর্ষণ ছিল। তা ছাড়া, যাদের মধ্যে করিম নূতন আদর্শ প্রচার করেন, তাদের ধর্মবিশ্বাস আর নীতিও এমন কোনো অনড় কাঠামোতে ক্লিষ্ট হয় নি, যা অতিক্রম করে এ আদর্শে সাড়া দেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। এ অঞ্চলে নূতন আবাদযোগ্য জমিলাভের আশায় নানা উপ-জাতি এবং অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত কৃষকেরা ক্রমান্বয়ে বসতি স্থাপন করে। নানা উপজাতির মিশ্রণের ফলে তাদের আদি সমাজ-সংগঠন, ধর্মবিশ্বাসও অনেকখানি পালটে যায়। উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে যে ধরনের যৌথ সমাজব্যবস্থা দেখা যায়, এখানে তা অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে।

করিম-পুত্র টিপু সম্পর্কে মরিসনের একটা মন্তব্য পাগলপন্থার জনপ্রিয়তা বুঝতে সাহায্য করে। টিপু-বিরোধী ঝাঁজ এখানে সুস্পষ্ট। কিন্তু এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, আদি পাগলপন্থা কিভাবে স্থানীয় লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল। মরিসনের মতে[২৬] বিদ্যাবুদ্ধি, পড়াশুনো বলতে টিপু পাগলের কিছুই ছিল না। তাই বিকৃত-রুচির পাহাড়িয়া, এবং হাজং, ডালু, বোনাও, ছত্রি, বাংশী ও ডাই জাতিভুক্ত সর্ব-নিকৃষ্ট শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান শিষ্যদের যাবতীয় বদগুণ আস্তে-আস্তে তার চরিত্রে ঢোকে। তার বাবার সব সৎশিক্ষা সে অচিরে ভুলে যায়···সাধারণ এ মানুষগুলোর কুসংস্কারময়তার জন্য জাদুবিদ্যার নানা কসরত দেখিয়ে সে নিজেকে এক নামী ফকির হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

পাগলপন্থায় বিশিষ্ট ধর্মীয় এবং নৈতিক আদর্শ অবশ্যই ছিল; কিন্তু উপজাতি ও অন্যান্য কৃষকগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের বহু যৌথ বিশ্বাস ধীরে-ধীরে তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, পরিবর্তন-প্রয়াসী কৃষকসমাজ বহু ক্ষেত্রেই নূতন সাংস্কৃতিক প্রভাবকে নিজেদের অভ্যস্ত জীবনচর্যার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। পাগলপন্থীদের ক্ষেত্রে এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন জীবন-যাপন সংক্রান্ত ব্যাপারে করিম তাঁর শিষ্যদের কোনো কঠোর, অনমনীয় অনুশাসনে আবদ্ধ করতে চান নি।

অব্যাহত প্রাচীন বিশ্বাসগুলির অন্যতম প্রধান ছিল জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস। টিপুর 'জাদুবিদ্যার কসরত' দেখানো সম্পর্কে মরিসনের মূল সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। তার ধারণা, সাধারণ মানুষের 'কুসংস্কার' ভাঙিয়ে টিপু ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও প্রভাব কায়েম করতে চেয়েছিল। জাদুবিদ্যার সামাজিক তাৎপর্য এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে।

জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসের দুটি প্রধান দিক: জাদু-শক্তি প্রাকৃতিক শক্তি থেকে ভিন্ন; বস্তুত, প্রাকৃতিক শক্তির উপর প্রভুত্ব অর্জনের একটা প্রধান উপায় জাদুশক্তি; দ্বিতীয়ত, জাদুশক্তির যথাযথ প্রয়োগ বিশেষ কোনো ব্যক্তির অনন্যসাধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে; এ প্রয়োগ বহুক্ষেত্রে সমগ্র গোষ্ঠীর স্বার্থে। এ প্রয়োগের সামাজিক কল্যাণের জন্যই জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসের সঙ্গে পাগল-পন্থার অনুসরণে কোনো অসঙ্গতি ছিল না। প্রকৃতির শক্তি নিয়ন্ত্রণে মানুষের সীমিত ক্ষমতার জন্যই সচরাচর জাদুবিশ্বাসের জন্ম। কিন্তু এ ক্ষমতার উল্লেখ-যোগ্য বৃদ্ধি ঘটলেই যে এ বিশ্বাস দূর হয়ে যাবে, তা মোটেই নয়।

শ্রীভদ্র দেখিয়েছেন,[২৭] এ ধরনের মিশ্রণ এ

অঞ্চলের পীর-ঐতিহ্যের একটা লক্ষণীয় দিক। তত্ত্বগত-ভাবে সুফীবাদের সঙ্গে এ বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ যোগ নেই। কিন্তু জাদুবিদ্যা-প্রয়োগের বিশেষ ক্ষমতা পীরের উপর আরোপিত হয়। এর একটা কারণ, সুফী-সাধনায় গুরুর বিশিষ্ট ভূমিকা, যার উল্লেখ আগেই করেছি। গুরুকেন্দ্রিক এ সাধনার একটা পর্যায়ে ভগবানের বিভূতি ভগবৎসাধনার পথনির্দেশক গুরুর উপর আরোপিত হতে থাকে।

কিন্তু ঐতিহ্যের প্রভাব এমনই প্রবল ছিল যে একেবারে গোড়া থেকেই শিষ্যরা গুরু করিম, গুরুপত্নী ও গুরুপুত্র টিপুকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। কথিত আছে, করিমের বিপুল জনপ্রিয়তার একটা প্রধান কারণ, ছুরারোগ্য রোগ নিরাময়ে তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে শিষ্যদের বিশ্বাস। পাগলপন্থী ঐতিহ্যানুযায়ী করিম নিজেই এ ক্ষমতার অধিকার দাবি করতেন। নিজে তিনি দাবি করুন বা নাই করুন, তাঁর এ ক্ষমতায় শিষ্যদের অবিচল আস্থাই যথেষ্ট ছিল।

পীর-সাধনার স্থানীয় ঐতিহ্য যে এ বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ঐতিহ্য না থাকলে এ ধরনের বিশ্বাসের জন্ম হত না, এ ধারণা অমূলক। বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী উপজাতিদের অন্য তিনটি আন্দোলনে এ বিশ্বাস বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল।

উৎস যাই হোক, অলৌকিক জাদুক্ষমতা প্রয়োগের নানা রূপ; কিন্তু তারাও নির্দিষ্ট নয়। বিশেষ অবস্থায় সম্পূর্ণ নূতন রূপে এ প্রয়োগ দেখা যেতে পারে। সাধারণভাবে, দৈনন্দিন জীবনের নানা বিপদ-আপদের ক্ষেত্র এ প্রয়োগ সীমাবদ্ধ থাকে—যেমন কঠিন কোনো রোগ-নিরাময় বা আকস্মিক কোনো দুর্বিপাকের অবসান। কিন্তু পাগলপন্থী আন্দোলনে ক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেটা বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দুর্দশা দূর করার উপায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। নেতার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী সুসংবদ্ধ এক আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পাগলপন্থী আন্দোলনের লক্ষ্যে এ মৌলিক রূপান্তরের কারণ শুধু জমিদারি স্বৈরাচারের আকস্মিক তীব্রতা বৃদ্ধি নয়; এ বিশ্বাস ছাড়া এ রূপান্তর ঘটত না।

৭.২

এটা অনস্বীকার্য যে জমিদারবিরোধী সংঘর্ষে পাগল নেতাদের ভূমিকা না থাকলে পাগলপন্থার প্রভাব এত বিস্তীর্ণ হতে পারত না।

এ সংঘর্ষের কারণ-বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। তবে এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রয়োজন।

(ক) জমিদারদের প্রজাপীড়ন তখনকার বাঙলা-দেশে অতি সাধারণ ঘটনা। তবে শেরপুর-জমিদারদের নানা বেআইনি কাজকে এ ধরনের প্রজা-পীড়নের সমগোত্রীয় মনে করা সমীচীন মনে হবে না। এ অঞ্চলের জমিদার-প্রজার তিক্ত সম্পর্কের এমন কতগুলো কারণ ছিল, যা বাঙলার সব অঞ্চল সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

(খ) এ অঞ্চলের উপর মোঘল শাসনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল অপ্রত্যক্ষ এবং একেবারেই সীমিত। প্রাক্-মোঘল যুগের সামন্তরা জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি পেল; কিন্তু জমিদারদের আনুগত্য সম্পর্কে সংশয় না থাকলে মোঘলরাজপ্রতিনিধি কদাচিৎ জমিদারি পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করত। প্রজাদের খাজনার হার ও পরিমাণ নির্ধারণে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকাই ছিল না।

(গ) গোড়ার দিকে ব্রিটিশরাজশক্তিও জমিদারের এ নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণের বিশেষ চেষ্টা করে নি, যদিও নানা কারণে মাঝেমধ্যে কোম্পানি এ অঞ্চলে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। একটা বিশেষ ব্যতিক্রম ছিল। গারো পাহাড়ের অধিবাসীদের উপর তুলো এবং অন্যান্য সামগ্রীর সওদায় জমিদারেরা

যে জুলুম চালাত, সরকার তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। তাতে এ জুলুম খানিকটা কমে; কিন্তু সমতলের কৃষকদের উপর জমিদারের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত থেকে যায়।

(ঘ) প্রধানত শরিকি-বিবাদের ফলেই, ১৭৭০-এর দশক থেকে জমিদার-প্রজা সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর চাষবাসের দ্রুত প্রসারের ফলে এবং অন্যান্য কারণে এ বিবাদ আরো বাড়ে। বিভিন্ন জমিদারগোষ্ঠীর অন্তর্বিবাদ কোনো-কোনো অবস্থায় কৃষকদের পক্ষে মঙ্গলজনকও হতে পারে, কারণ জমিদারি প্রশাসন এতে দুর্বল হয়; খাজনা (ও আবওয়াব) আদায়ের বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত আমলাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যাহত হয়। কৃষকেরা এর সুযোগ নিতে পারে, প্রধানত বিচ্ছিন্ন-ভাবে জমিদারি অনুশাসনকে উপেক্ষা করে।

শেরপুরের শরিকি বিবাদ ভিন্ন ধরনের। তা শুধু-মাত্র আইন-আদালত মারফত বিতর্কিত অধিকার প্রতিষ্ঠার উপায় নয়; প্রায়শ তা ছিল সহিংস, রক্তক্ষয়ী,—বিবদমান গোষ্ঠীর লাঠিয়ালদের মধ্যে সংঘর্ষ। সদর দেওয়ানি আদালত বিবাদ-মীমাংসার উপায় হিসেবে বাটোয়ারার বিধান দেয়; কিন্তু বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী এ নির্দেশ উপেক্ষা করে। তাই আবার সংঘর্ষ ঘটে। এ সংঘর্ষ মাঝে-মাঝে এমন পর্যায়ে পৌঁছাত যে প্রশাসনকে সৈন্যবাহিনী তলব করতে হত—যেমন ১৮০৩ ও ১৮০৮ সালে। ১৮০৮ সালে আটাত্তর গ্রাম এভাবে সর্বস্বান্ত হয়।

(ঙ) তা ছাড়া, এ ধরনের সংঘর্ষের ফলে জমিদার-দের অতিরিক্ত অর্থের যোগাড় করতে হত। তাই অনিয়মিত আবওয়াব আদায় করা ছাড়া তাদের অন্য উপায় ছিল না।

(চ) শরিকি-সংঘর্ষ যখন চরমে উঠত, সরকার সাময়িকভাবে নিজের মনোনীত ব্যক্তির উপর জমিদারি পরিচালনার ভার দিত। ধারণা ছিল, এতে শরিকি কোন্দল কমবে। কিন্তু ফল অনেক সময় বিপরীত হত। এর প্রধান কারণ সরকারি প্রতিনিধির অসততা। অবৈধ আবওয়াব আদায় বন্ধ করার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপেও হিতে বিপরীত হত। সরকার ভাবল, হুকুম জারি করে দীর্ঘদিনের এ জমিদারি রেওয়াজ বন্ধ করা যাবে। ১৮১৬ এবং ১৮১৮ সালে সরকার নির্দেশ দিল, আলাদাভাবে আবওয়াব আদায় করা চলবে না, একটা নির্দিষ্ট হারে খাজনা আদায় করতে হবে। এ আদেশ জমিদার মানে নি। ১৮২১ সালে কানুনগো পদ পুনঃপ্রবর্তনের জন্য সরকারি চেষ্টায় জমিদারেরা প্রমাদ গুনল। তাদের আশঙ্কা ছিল, এবার বেআইনি আবওয়াবের কথা সব ফাঁস হয়ে যাবে; এমনকী সরকার আইন করে ওগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ করেও দিতে পারে। সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের জন্য তারা আগে থেকেই খাজনার হার আর পরিমাণ বাড়িয়ে দিল।

(ছ) এ ধরনের জমিদারি স্বৈরাচার হামেশাই ঘটছিল। এর একটা প্রধান কারণ, সরকারি প্রশাসনের শিথিলতা, বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা।

৭.৩

জমিদারবিরোধী বিক্ষোভ তাই ক্রমেই বাড়তে থাকে। সরকারি নথিপত্র থেকে প্রতিবাদী কৃষকদের সঙ্গে পাগল নেতৃত্বের ক্রমবর্ধমান সংযোগ অনুমান করা যায়।

করিমের মৃত্যুর (১৮১৩) পর থেকে পাগলপন্থী সংগঠনে পরিবর্তন ঘটে। অন্তত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, টিপুর আমলেই পাগলপন্থীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। মরিসন জানতে পারেন, অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই শেরপুরে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে টিপু নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কায়েম করে। পাগল-দলের কোনো-কোনো কাজকে মরিসন স্রেফ ডাকাতি বলেছেন।[১৮] এ কাজের বিস্তারিত বিবরণ নেই। তবে জমিদার-কৃষক সম্পর্কে তিক্ততা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে 'ডাকাতি' হয়তো জমিদার-বিরোধী সংঘর্ষের কোনো ঘটনা ছিল। সরকারি আইনে সংঘবদ্ধ

কৃষক-প্রতিরোধকে বর্ণনা করার অন্য কোনো ভাষা নেই। অন্য একটা দৃষ্টান্ত থেকেও এটা স্পষ্ট হবে। মরিসনের প্রতিবেদন অনুযায়ী,[৯৯] টিপুর রাজদ্রোহ-মূলক এক ঘোষণার উপলক্ষ নাকি, এক সাধারণ সিঁদেল চুরির ঘটনা (১৮২৪)। টিপু তখন তার সহগামীদের বলে—কোম্পানি রাজ শেষ হতে চলেছে ; সেই হবে শেরপুর পরগনার সর্বেসর্বা ইত্যাদি। সিঁদেল চুরিতে সহগামীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য কোম্পানিরাজ অবসানের আসন্নতা সম্পর্কে বৈপ্লবিক ঘোষণার কোনো প্রয়োজন ছিল কি ?

পাগলপন্থী কৃষক বিক্ষোভের সবচাইতে উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত।

১৮২৩-২৪ সাল পর্যন্ত পাগল-আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সীমিত—জমিদারের বেআইনি কাজে বাধা দেওয়া : অবৈধ আবওয়াব আদায়ের চেষ্টা প্রতিরোধ করা। কোথাও তারা এ কথা বলে নি যে জমিদারি কর্তৃত্বের অবসান হোক। সহিংস প্রতিরোধ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল : কিন্তু আন্দোলনের প্রধান রূপ ছিল, সম্মিলিতভাবে আদালতে জমিদারদের দাবিকে বেআইনি প্রমাণ করা। আদালতে গিয়েও কোনো সুরাহা হচ্ছিল না বলে তারা ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল। আইনমাফিক প্রতিরোধের ভঙ্গিও মোটেই গতানুগতিক ছিল না। সাধারণত বাদী ও বিবাদী পক্ষ নিজেদের বক্তব্যের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য উকিল ইত্যাদি মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে। পাগলপন্থীরা শুধু এতেই নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। দল বেঁধে আদালতের কাছে জমায়েত হত।

৭.৪

১৮২৪ সালের শেষের দিকে এ আন্দোলনে মৌলিক, পরিবর্তন ঘটতে থাকে।[১০০] আন্দোলনের লক্ষ্য তখন শুধুমাত্র জমিদারি স্বৈরাচারের প্রতিরোধ নয়—জমিদারতন্ত্র ও কোম্পানিরাজের অবসান ; স্বাধীন পাগলরাজের প্রতিষ্ঠা। তাদের বিশ্বাস ছিল, শুধুমাত্র এতেই তাদের সব দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটবে। তাদের আরো বিশ্বাস ছিল, এ লক্ষ্য দুঃসাধ্য কিছু নয় ; কারণ তাদের নেতাদের অলৌকিক ক্ষমতার জন্য তাদের প্রতিরোধ দুর্জয় হবে।

আন্দোলনের এ মৌলিক পরিবর্তনের পটভূমিকা হিসেবে দুটো প্রধান ঘটনাকে চিহ্নিত করা যায়। ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে (১৮২৪-২৬) নানাভাবে জমিদারদের প্রজাপীড়নের তীব্রতা হঠাৎ বেড়ে যায়। দ্বিতীয় ঘটনা—বিদ্রোহীদের মানসিকতায় গুরুত্বপূর্ণ এক পরিবর্তন ; তাদের এক দৃঢ় প্রত্যয় যে ব্রিটিশরাজ জমিদার-বিরোধী কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নেবে না।

আসলে, বিদ্রোহীদের এ নূতন উপলব্ধিই আন্দোলনে এ মৌলিক পরিবর্তনের প্রধান কারণ। স্বর্ণযুগ আবির্ভাবের নিশ্চিত সম্ভাবনায় বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত সব কৃষক-বিদ্রোহেই এ উপলব্ধির প্রধান ভূমিকা লক্ষ করা যায়। এ ধরনের আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের মধ্য দিয়ে শোষক-শ্রেণীর প্রভুত্বের অবসান ঘটানো। স্বভাবতই যদ্দিন এ বিশ্বাস থাকে যে তদানীন্তন রাষ্ট্রব্যবস্থা শোষকগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে, কৃষকদের ন্যায্য দাবিকে সহানুভূতি নিয়ে বিচার করবে, অর্থাৎ রাজশক্তি প্রকাশ্যে জমিদার বা অন্য প্রবল শ্রেণীর পক্ষ নেবে না—তত দিন বিকল্প রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের প্রশ্ন আসে না। এ বিশ্বাস ভেঙে গেলেই এ ভিন্ন মানসিকতার জন্ম হয়। এমন নয়, কৃষকদের বিচার সবক্ষেত্রেই অভ্রান্ত। যে ধারণার উপর এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত, সে ধারণা ভুল হতে পারে ; কিন্তু এখানে যা প্রাসঙ্গিক, তা হল কৃষকদের এ বিশেষ মানসিকতা বোঝা। ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর। সচরাচর এ উপলব্ধি আসে আকস্মিক কোনো অভিঘাতের জন্য। এ আকস্মিকতার জন্যই মানসিকতায় এত দ্রুত

পরিবর্তন আসে। এমন নয় যে রাজশক্তির ন্যায়-পরায়ণতা সম্পর্কে কৃষকদের আগে কখনও অবিশ্বাস বা সন্দেহ জন্মায় নি। কিন্তু নানা কারণে সে সন্দেহ এক নিশ্চিত প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হয় নি। তা ছাড়া, এ নূতন ধরনের আন্দোলন শুরু করার আগে কৃষক-দের নানা দিক বিচার-বিবেচনা করতে হয় ; কারণ এতে ঝুঁকি অনেক ; পরাজয় শোষকশ্রেণীর ক্ষমতা আরও মজবুত করবে, এটাও তারা জানত। তাই সংকল্পকে কার্যকর করার আগে কৃষকদের মনে আসে নানা সতর্ক বিচার, দ্বিধা, সংশয়। এ নূতন আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নিতে বহুদিন সময় লেগেছিল। ঝোঁকের মাথায় বিদ্রোহীরা কিছু করে নি।

রাজশক্তি সম্পর্কে এ নূতন ধারণার কারণও ভিন্ন। ব্রিটিশরাজ সম্পর্কে তাদের পূর্বেকার অবিশ্বাস-এর কারণ, জমিদারের নানা বেআইনি কাজ বন্ধ করার জন্য সরকারি তৎপরতার অভাব। তা ছাড়া, অসহিষ্ণু কৃষকেরা নিজেরা সংঘবদ্ধ উদ্যোগ নিলে, সরকার সঙ্গে-সঙ্গে পালটা ব্যবস্থা নিয়েছে, যাতে 'উত্তেজনা' না বাড়ে। কিন্তু নূতন আন্দোলনের আগে যে ঘটনাগুলি কৃষকদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, তার প্রায় সবগুলির সঙ্গে সরকারের ছিল প্রত্যক্ষ যোগ। এ ঘটনাগুলির তাৎপর্য শুধু আগেকার মতো অতিরিক্ত খাজনা বা আবওয়াবের দাবি নয়। সমগ্র আঞ্চলিক কৃষি-অর্থনীতির উপর এতে এক গুরু বোঝা চাপে। শুধু তাই নয়। আগে সংঘবদ্ধ কৃষকেরা নানাভাবে অতিরিক্ত খাজনার দাবি বেশ কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারত। এখন তার কোনো উপায় থাকল না।

নূতন ঘটনাগুলি ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত। সামরিক প্রয়োজন বলেই এ সম্পর্কিত সরকারি সব নির্দেশ অতি দ্রুত কার্যকর করতে হত। অথচ এ প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার নিজে করতে পারত না। জমিদারের উপর নির্ভরতা তাই অপরিহার্য ছিল। আর এ জরুরি অবস্থায় সরকারের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রজাপীড়ন প্রায় অনিবার্য উঠেছিল।[১০১]

দূর বার্মা সীমান্তে যুদ্ধের প্রয়োজনে সৈন্যচলাচল এবং সামরিক উপকরণ পাঠানোর জন্য সবচাইতে জরুরি ছিল এক দীর্ঘ নূতন রাস্তা—শেরপুরের পাশ দিয়েই এ রাস্তা গিয়েছিল। এ অঞ্চলের কৃষি-অর্থ-নীতি এমন ছিল না যে, অনেক শ্রম উদ্‌বৃত্ত থাকত। কৃষিতে নিয়োজিত প্রযুক্তিতে এমন কোনো উন্নতি হয় নি যার ফলে জমির উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে যেতে পারত এবং চাষবাসের কাজ অপেক্ষাকৃত কম শ্রম দিয়ে চালানো যেত যার ফলে চাষবাসের জন্য আগের মতো শ্রমের দরকার হত না। অন্যান্য অনেক অনুন্নত কৃষিব্যবস্থার মতো, এখানেও শ্রম উদ্‌বৃত্ত থাকত, বছরের কোনো-কোনো সময়। যখন চাষের কাজ বিশেষ কিছু থাকত না। কিন্তু জমি চাষ শুরু হওয়ার সময় থেকে ফসল তোলার সময় পর্যন্ত উদ্‌বৃত্ত শ্রম তো থাকতই না, প্রয়োজনীয় শ্রমে টান পড়ত। এর জন্য গ্রামে-গ্রামে কৃষকেরা বিশেষ ব্যবস্থা করত, বা ফসল কাটার সময় অনেক জায়গায় বাইরে থেকে মজুর আনতে হত। মোটামুটিভাবে বছরের পাঁচ-ছয় মাস শ্রমের এ টান চলত। এটা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য যে, শেরপুরে নূতন রাস্তা বানানোর বেশির ভাগ কাজ করতে হয়েছিল ১৮২৪ সালের জুন থেকে নভেমবর পর্যন্ত—এবং নভেমবরেই সংঘবদ্ধ প্রতি-রোধের সূচনা। শ্রমের প্রয়োজন তো শুধু রাস্তা বানানোর জন্য নয়, সামরিক নানা কাজের জন্যই তো শ্রমের দরকার—বিশেষ করে বিরাট সৈন্যবাহিনী যখন সীমান্তের দিকে এগুচ্ছিল।

বিপুলপরিমাণ এ শ্রমের যোগান দেওয়া জমিদারের পক্ষে সহজ ছিল না। যেখানে চাষবাসের জন্য বড়ো ধরনের সেচ-ব্যবস্থা চালু ছিল, সেখানে গ্রামীণ প্রথা অনুযায়ী জমিদার এ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম গ্রাম থেকে বিনামূল্যে চাইতে পারত। সাধারণত সেচব্যবস্থায় কোনো বড়ো ধরনের মেরামতি দরকার হলে গ্রামবাসীরা বেগার শ্রম বিনা

প্রতিবাদেই দিত। অন্যত্র গ্রামের শ্রমের উপর জমিদারের কোনো অধিকার ছিল না।

তাই সামরিক কারণে প্রয়োজনীয় বিপুল-পরিমাণ শ্রমের যোগান দেওয়ার জন্য জমিদারের পেয়াদা বা আমলাদের জোরজুলুম করতে হত। সরকারের চাহিদার অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতা ছাড়াও দুটো কারণে এ কাজ জমিদারের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে-ছিল। জমিদার মজুরদের যথোচিত মূল্যও দিচ্ছিল না বা দিতে পারছিল না। তারা হয়তো ভেবেছিল, জমিদারের হুকুম মেনে চলা প্রজার অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব; ঠিক-ঠিক মজুরি দিতে না পারলেও প্রজা-দের প্রতিবাদ দস্তরসম্মত হবে না। (বাঙলায় এবং বিহারে শ্রমিকদের বাজারদর থেকে অনেক কম মজুরি দেওয়া সম্পর্কে অভিযোগ য়ুরোপীয় নীলকরেরা এভাবে খণ্ডন করতে চেষ্টা করত।) কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একসঙ্গে অত মজুরি যোগানো জমিদারের পক্ষে সহজও ছিল না। আইন-অনুযায়ী সরকার জমিদারদের প্রয়োজনীয় এ অর্থ দিতে বাধ্য ছিল। শেরপুরের জমিদারেরা অভিযোগ, সরকার থেকে তাদের প্রাপ্যের অতি সামান্য অংশই নির্দিষ্ট সময়ে তারা পেয়েছে। এ অভিযোগ পরের সরকারি অনু-সন্ধানে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সরকারি নির্দেশ পালনে জমিদারের অসুবিধের আর-একটা কারণ, প্রকাশ্য রাস্তায় দিনমজুর হিসেবে খাটতে অনেক কৃষকের তীব্র আপত্তি ছিল। তাদের অভিযোগ, এ ধরনের দিনমজুরিতে তাদের জাত যাবে।[১০২] এমনিতে দিনমজুরি খাটার প্রথা ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত ছিল। জাত খোয়া যাবে—এ অভি-যোগে তারা অন্যের জমিতে মজুরি নিয়ে কাজ করতে অনিচ্ছুক ছিল, এমন দৃষ্টান্ত সুলভ নয়। অনুমান করা যায়, জমিদারের ঠিকাদারের কৃষকদের এমনভাবে খাটাত, যাতে এ ধরনের কাজে তাদের খুব আপত্তি ছিল।

এসব কারণে প্রয়োজনীয় শ্রমের যোগান জমি-দারেরা স্বাভাবিক উপায়ে দিতে পারত না। তাই জোরজুলুমের আশ্রয় নেওয়া তাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

একই ভাবে, গ্রাম থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন সামরিক উপকরণের জন্যও কৃষক বা অন্যান্যরা ঠিক-ঠিক দাম পেত না। সরকারি বিবরণে এ অভিযোগের সত্যতাও স্বীকৃত হয়েছে।

শুধু যে শ্রম এবং সামরিক উপকরণের যথাযথ মূল্য থেকে কৃষকেরা বঞ্চিত হয়েছিল, তাই নয়। এসব উপকরণ যোগানোর জন্য জমিদারকে অতিরিক্ত খরচ করতে হচ্ছে, এ অজুহাতে তারা প্রজাদের উপর নূতন এক আবওয়াব বসাল—খরচা রসিদি পলটন: অর্থাৎ সৈন্যদের রসদ যোগানোর খরচ হিসেবে কৃষক-দের এটা দিতে হবে।

কৃষকদের ক্ষতির এখানেই শেষ নয়। যেখানে সামরিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাস্তা যথেষ্ট ছিল না, জলপথ ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। সরকার প্রয়োজনীয় নৌকা সরবরাহের জন্যও জমিদারদের ভার দিল। কৃষক এবং অন্যান্যদের অভিযোগ, এর জন্য দেওয়া মূল্য পর্যাপ্ত ছিল না। তা ছাড়া, যাদের জীবিকা নৌকা-ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত ছিল—যেমন মৎস্যজীবী বা খুদে ব্যবসায়ী, তাদের ক্ষতিই ছিল বেশি। কৃষকেরাও বহুক্ষেত্রে গঞ্জে বা শহরে নৌকায় সওদা বিকিকিনি করত। এমনও ঘটেছে, শত্রু যাতে নৌকা-ব্যবহারের সুযোগ না পায়, সরকার সেজন্য হুকুমনামা জারি করে বলেছে: সব নৌকা যেন বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়।

ব্রহ্মযুদ্ধের থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি তাই আগের থেকে গুণগতভাবে পৃথক। অতিরিক্ত খাজনা আবওয়াব আদায়ের সঙ্গে যুক্ত জমিদারি স্বৈরতন্ত্রের যা চেহারা, নূতন পরিস্থিতিতে তা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। তা ছাড়া, জমিদার এবং রাজশক্তির স্বার্থের অভিন্নতা কৃষকদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

বিকল্প রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠাই সমগ্র

কৃষকসমাজের কাছে এ গভীর সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় বলে মনে হল। তার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন বর্তমান রাজশক্তির বিভিন্ন হাতিয়ারকে ধ্বংস করা বা পঙ্গু করা। এর জন্য দরকার সংঘবদ্ধ হিংসা। কৃষকদের কাছে বর্তমান রাজশক্তির একমাত্র প্রতীক ছিল স্থানীয় পুলিস, আদালত। সামরিক বাহিনীর স্থানীয় রূপ হয়তো কিছু ছিল না; কিন্তু কৃষকেরা মাঝে-মাঝে এর পরাক্রমের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছে। আর ধ্বংস করতে হবে জমিদারি আমলার কর্তৃত্ব; বহু বিস্তীর্ণ এর এলাকা, এর কার্যকারিতাও অনেক বেশি প্রত্যক্ষ।

এ সহিংস প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র ক্ষণিক আক্রোশের ফল নয়। হিংসার একটা উদ্দেশ্য হতে পারে নানাভাবে শত্রুর ক্ষতিসাধন—সম্পত্তির ক্ষতি, জমিদারের ঘরদোর, খামারবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, সুযোগ পেলে শত্রুর প্রাণসংহারও। বিদ্রোহী কৃষকদের এও বিশ্বাস ছিল, শত্রু এতে দুর্বল হবে; হিংসা-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখে কৃষকদের সঙ্গে ব্যবহারে শত্রু আগের মতো ঔদ্ধত্য দেখাবে না, অনেক বেশি সতর্ক হবে। নূতন পরিকল্পিত আন্দোলনে হিংসাপ্রয়োগের লক্ষ্য অনেক বেশি ব্যাপক—শত্রুর দৃঢ়মূল কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলা। অনেক কঠিন এ সংকল্পের রূপায়ণ। তাই প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্কতার প্রয়োজন।

সরকারি নথিপত্র থেকে অনুমান করা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে তাদের প্রস্তুতি চলছিল। শুধুমাত্র এটাই যথেষ্ট নয়। দরকার ছিল শত্রুর অনিবার্য পরাজয় সম্পর্কে এক নিশ্চিত প্রত্যয়ের। মনে হয়, বিক্ষুব্ধ কৃষকদের কেউ-কেউ এ বিষয়ে করিমের পত্নী, (যাকে শিষ্যরা 'মা-সাহেবা' বলে ডাকত), আর পুত্র টিপুর সঙ্গে পরামর্শ করেছিল ('They consulted soothsayers')। তাঁরাই আশ্বাস দেন যে, শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষে তাদের জয় সুনিশ্চিত। টিপুর আমল থেকেই পাগল-সংগঠনের দ্রুত পরিবর্তনের কথা আগে উল্লেখ করেছি। তাই তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছিল। কোনো-কোনো জায়গায় দেখা গেছে, বিদ্রোহী কৃষকেরা নেতা খুঁজে বেড়িয়েছে। এখানে তেমনটি হয় নি। টিপুকে ধর্মীয় গুরু হিসেবে তারা আগেই মেনে নিয়েছে; এটা সহজেই অনুমেয়, জমিদারের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বৈরিতায় তারা টিপুর নানা নির্দেশও পেয়েছে। টিপুর এবং তাঁর মার অতিপ্রাকৃত, দৈবী শক্তিতে বিশ্বাস তাদের অনেকদিন ধরেই ছিল। এ অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগের রূপটাই শুধু এখন পালটাল। এখন তারা বিশ্বাস করল, সামরিক সাজসরঞ্জামের দিক থেকে আপেক্ষিক দুর্বলতার জন্য তাদের হীনম্মন্যতার কোনো কারণ নেই; কারণ টিপুর আর তার মার দেবীশক্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে তারা অপরাজেয় হবে।

বিদ্রোহীরা তাই নেতা বানায় নি; নেতৃত্ব আগে থেকেই ছিল; তার ভূমিকার রূপান্তর মাত্র।

নেতার আশ্বাসবাণীর কথা অতিদ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে গেল। শিষ্যরা এখন বিশ্বাস করল: নেতারা যাই ইচ্ছা করবেন, তাই করতে পারেন, এমন-কী তাদের মন্ত্রপূত কাঠের বন্দুক আর তলোয়ার সত্যিকারের বন্দুক আর তলোয়ারের মতোই কার্যকর; তবে সে কাঠ যোগাড় করতে হবে এক বিশেষ গাছ থেকে; ব্রিটিশদের কামান পাগলদের দৈহিক কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; কারণ নেতার অলৌকিক শক্তি অদৃশ্য দুর্ভেদ্য বর্মের মতো কাজ করবে; মা-সাহেবা যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে শুধুমাত্র কাপড় ঝেড়েই লুকোনো সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির করতে পারেন।[১০৩] আগেই উল্লেখ করেছি, নূতন ধর্মমতের ব্যাপক প্রসারেও পাগলদের জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস দুর্বল হয় নি। বিদ্রোহের মুহূর্তে এ বিশ্বাস তাদের মানসিকতায় রূপান্তর ঘটায়।

৭.৫

বিকল্প সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আসন্ন আবির্ভাব সম্পর্কে পাগলদের সব বিশ্বাস টিপুকে

কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এটা উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটিশরাজের বিকল্প হিসেবেই শিখ্‌রা টিপুর সার্বভৌমত্ব কল্পনা করেছিল। সরকারি নথিপত্র থেকে এ বিশ্বাসের কয়েকটা দিক সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।[১০৪] সর্বাত্মক প্রতিরোধ শুরু হবার কিছু আগে বা পরে পাগলদের মধ্যে এ বিশ্বাস বিশাল এলাকায় পরিব্যাপ্ত ছিল। পাগলরা বলত, টিপু এবং তার মার মুখ থেকেই সরাসরি সব ঘোষণা এসেছে।

প্রতিরোধের শুরুতে টিপুর এক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে: খুব শীগগির এক নূতন শক্তির আবির্ভাব ঘটবে; ফলে তাদের সব দুঃখ-দুর্দশার অবসান হবে; ব্রিটিশরাজের অবসান আসন্ন; তার বদলে আসবে পাগল-রাজার ('Paugal Patriarch') নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব; ফকির টিপু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করবে; জমিদারদের স্বেচ্ছাচার চিরকালের মতো লুপ্ত হবে; আবওয়াব, বেগার ইত্যাদির অস্তিত্বই থাকবে না; প্রতি-'কুর' চাষের জমির খাজনা ধার্য হবে মাত্র চার আনা; নূতন জমির জন্য প্রথম তিন বছর কোনো কিছুই দিতে হবে না।

এসব ভবিষ্যদ্বাণী কৃষকদের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল। এ ধরনের বাণী কৃষকসমাজে কী বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা একটা ঘটনা থেকে বোঝা যায়। খ্যাতির মোহে কেউ-কেউ টিপুর বাণী আর ভঙ্গিকে অনুকরণ করে "ভবিষ্যদ্বক্তা"রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করল। যেমন তুর্কশাহ নামে এক ফকির বলে বেড়াচ্ছিল—কোম্পানিরাজের অবসানের পর সেই হবে সর্বেসর্বা, টিপু নয়; কোম্পানির লোকজন হবে তার আজ্ঞাবাহী 'ভৃত্যে'র মতো। তুর্কশাহের কিছু অনুগামী যে জোটে নি তা নয়; কিন্তু টিপুর কর্তৃত্ব ছিল অপ্রতিহত; এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর তুর্কশাহের কোনো প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না। এ ঘটনা এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে এর থেকে বিদ্রোহী কৃষকদের মানসিকতা বোঝা যায়। পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থার জন্য তাদের তীব্র ব্যাকুলতার জন্যই তারা এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করেছিল। কৃষকদের চিত্ত জয় করার জন্য তুর্কশাহকেও বলতে হয়েছিল—কোম্পানির রাজত্ব শেষ হতে চলেছে।

আসলে বিদ্রোহী কৃষকদের চেতনার রূপান্তর বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন প্রধানত জমিদারি স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে। নূতন আন্দোলনে সে লক্ষণ অবশ্যই ছিল; কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে পাগলদের স্বাধীন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের স্বপ্ন। জমিদার-বিরোধী ঘোষণায় অনিবার্যভাবে অবৈধ খাজনা আর আবওয়াব আদায়ের কথা এসেছে; কিন্তু সেখানেও দেখি সম্পূর্ণ নূতন এক ঘোষণা: তারা জমিদারের কর্তৃত্বই স্বীকার করে না—কারণ, একমাত্র নিয়মসম্মত কর্তৃত্ব তাদের নেতা টিপুর। টিপুর সার্বভৌমত্বে অন্য সব কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন।

অন্য কর্তৃত্বকে অস্বীকার বা অমান্য করার জন্য প্রথম থেকেই সহিংস প্রতিরোধের কোনো দরকার ছিল না। যদি অমান্য করার জন্য শাসকশ্রেণী বা জমিদার তাদের উপর পীড়নের নীতি গ্রহণ করে, তাহলেই শুধুমাত্র হিংসার পন্থা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবেই পাগলপন্থী আন্দোলন সহিংস আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

আন্দোলনের গোড়ার দিকে পাগলরা বার-বার বলত, সৈন্যবাহিনীর ব্যবহারের জন্য নির্মীয়মাণ রাস্তায় তারা জমিদারের [হুকুমমত মজুর হিসেবে কাজ করবে না। কারণ এ ধরনের কাজের নির্দেশ তো টিপুর থেকে আসে নি; তারা টিপুকেই একমাত্র বৈধ কর্তৃত্ব বলে মানে। পুলিশ প্রথম-প্রথম কোনো জোরজুলুম করে নি। তবে হুকুমনামা জারি করে। বলেছে, পাগলরা যেন দল বেঁধে জমিদারের আজ্ঞা অমান্য না করে। এর উত্তরে পাগলরা বলল, এ ধরনের মেহনতে তাদের জাত যাবে; সৈন্যদের ঘোড়ার জন্যে ঘাস কাটাও তাদের ইজ্জতের পক্ষে হানিকর। সরকারি দলিলে এর ফল হিসেবে লেখা হল: পুলিশের কোনো কথাই ওরা

শুনছে না; অমান্য করছে জমিদারের কর্তৃত্বকে; রাস্তা তৈরির কাজ একদম বন্ধ।[১০৫]

১৮২৫ সালের শুরু থেকে পাগলপন্থী আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। টিপুর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সব ব্যবস্থাই তখন হয়ে গেছে। 'টিপু পাগলের রাজদরবার' স্থাপিত হল শংকরপুর-নামক জায়গায়, তাঁর নিজের বাসস্থানে। ঠিক কোন্ সময় এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল, সরকারি বিবরণে তার উল্লেখ নেই। সম্ভবত ফেবরুয়ারির গোড়ায় 'কোষাগার এবং রাজস্ববিভাগের অধ্যক্ষ' হিসেবে 'টিপু ভাই সাহেবে'র নাম ঘোষণা করল 'গোটা পাগল সম্প্রদায়'। কয়েকজন পাগলকে পুলিশ জেল থেকে ছেড়ে দিলে তারা বলে বেড়াল, টিপুর দৈবীশক্তির জোরেই তাদের গা থেকে শেকল খুলে পড়েছে, আপনা থেকেই। সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থাও হল। জোরজুলুম করে টিপুর সাগরেদরা অর্থ আদায় করছে—সরকারি মহলের এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। আসলে কৃষকেরা জমিদারকে খাজনা দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে তাদের পাগল রাজাকেই দিচ্ছিল। গ্রামে-গ্রামে ঘুরে নেতারা কৃষকদের নির্দেশ দিল, জমিদারদের খাজনা দেওয়া চলবে না। জমিদারের পেয়াদাদের সতর্ক করে দেওয়া হল: খাজনা আদায়ের জন্য তারা যেন গ্রামে না ঢোকে। পুলিশের লোক কী করবে ঠাহর করতে পারছিল না, কারণ 'হাঙ্গামাকারীদের ভয়ে কেউ গ্রামে ঢুকতে সাহস করছিল না।'[১০৬]

টিপু নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেছে; প্রশাসনের সব গুরুত্বপূর্ণ পদে তার অনুগামীদের নিযুক্ত করা হয়েছে; রাস্তা তৈরির কাজ প্রায় বন্ধ; জমিদারকে খাজনা না দেওয়ার জন্য নেতারা কৃষকদের 'প্ররোচিত' করছে; তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেই যাচ্ছে—পুলিশ হোক বা জমিদারের আমলা-পেয়াদা হোক, হুমকি, শাসানি দেওয়া হচ্ছে—সারা শেরপুর জুড়ে মার্চের গোড়াতেও এ অবস্থা। পাগলপন্থীদের শায়েস্তা করার জন্য পাঠানো হল ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট ড্যাম্পিয়ারকে। তাঁর মন্তব্য: শেরপুরের অবস্থাকে 'প্রায় বিদ্রোহ' বলা চলে।[১০৬ক]

হতে পারে, সম্ভ্রস্ত প্রশাসনের বিবরণে খানিকটা অতিরঞ্জন আছে। তবে বিদ্রোহের ব্যাপ্তি সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এমনিতে সরকারি বিবরণেও 'শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ' 'অরাজকতা' সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার বিশেষ উল্লেখ নেই। আছে ভাসাভাসা অভিযোগ। কিন্তু পাগলরা প্রকাশ্যে ব্রিটিশরাজকে উপেক্ষা করছে, তার বদলে নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছে—প্রশাসনের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

সমগ্র আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার তাই "রাজদ্রোহ" বলে গণ্য করল। শুধুমাত্র পুলিশ দিয়ে এদের দমানো সম্ভব হল না। সৈন্য নামানো হল পুলিশকে সাহায্যের জন্য। নির্দেশ দেওয়া হল, প্রথম সারির নেতাদের কোনো দয়া দেখানো হবে না; তাদের বাড়িঘর চুরমার করে দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হবে; যেসব ক্ষেত্রে কৃষকেরা 'হাঙ্গামা সৃষ্টির জন্য বদ্ধপরিকর', পুলিশ বা সেনাবাহিনী সেখানে বিশেষ ব্যবস্থা নেবে।

এভাবে আন্দোলনকে দমন করা হল। সরকার কিন্তু স্থানীয় জমিদারি-পরিচালনার গলদ স্বীকার করে নিল। কিছু সময়ের জন্য জমিদারদের সরিয়ে দেওয়া হল। পরিচালনার ভার সরকারি লোককে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য, খাজনার হার, পরিমাণ এবং আবওয়াব আদায় ইত্যাদি ব্যাপারে যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা এদ্দিন কৃষকদের বিক্ষুব্ধ করে তুলছিল, তা দূর করা।

কোনো-কোনো অযৌক্তিক আবওয়াব বাতিল করা হল। কিন্তু খাজনার হার ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি পুরানো ব্যবস্থাই বহাল থাকল।[১০৭] কৃষকেরা বারবার অভিযোগ করেছে, খাজনার হার নির্ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি একেবারেই দায়সারাভাবে করা হচ্ছে; বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জমিদারি আমলার সাক্ষ্যকেই ধ্রুবসত্য বলে মানা

হয়েছে; প্রতিবাদ করেও কোনো সুরাহা হয় নি; বরং তাদের কপালে জুটেছে 'বর্বরোচিত ব্যবহার'; তাদের পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে, জমিদারের কর্তৃত্ব তাদের মানতেই হবে; এবং প্রচলিত দস্তুর তারা ভাঙতে পারবে না। ঢাকাবিভাগের কমিশনার গোড়ায় কৃষকদের কিছু-কিছু অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন; কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, শেষে তিনিও তাঁর মত পালটালেন। এমনও বললেন, কৃষক-বিক্ষোভের আসল কারণ 'দু-তিনজন দাঙ্গাবাজ প্রকৃতির নেতার' উশকানি; আন্দোলন জিইয়ে রাখলে তাদেরই লাভ।

প্রতিরোধ তাই আবার অনিবার্য হয়ে উঠল। কিন্তু প্রথম আন্দোলনের প্রায় আট বছর পরে (১৮৩৩) এটা সম্ভব হল। প্রথম পরাজয়ের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে নিতে স্বভাবতই অনেক সময় লেগেছে। কৃষকেরা অনেক মূল্য দিয়ে এটা বুঝতে পেরেছে, জমিদার আর ব্রিটিশরাজের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা তত সহজ ব্যাপার না। তাই অনেক ব্যাপক প্রস্তুতির পর তারা লড়াইয়ে নামার সিদ্ধান্ত করল। তা ছাড়া, কৃষকেরা ভেবেছিল, সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে খাজনা ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের দীর্ঘদিনের অসন্তোষের কারণ দূর হবে। বিশেষ করে, কিছু সময়ের জন্য হলেও জমিদারদের অপসারণ তাদের খানিকটা আশ্বস্ত করেছিল।

আশাভঙ্গ যখন হল, কৃষকেরা আবার বড়ো সংঘর্ষের জন্য নিজেদের সংগঠিত করতে সচেষ্ট হল। এবারকার আন্দোলনের একটা উল্লেখযোগ্য দিক, নেতাদের দৈবীশক্তির উপর নির্ভরতা আগের মতো ছিল না। এ শক্তি গতবারের সংঘর্ষে ব্রিটিশ সৈন্যের কার্যকারিতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি—এ রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের মোহভঙ্গের একটা কারণ হতে পারে! অবশ্য আমাদের অনুমানের একমাত্র ভিত্তি, সরকারি বিবরণে নেতাদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস সম্পর্কে অনুল্লেখ। এমনও হতে পারে, সরকার এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারে নি, বা জানলেও তাকে গুরুত্ব দেয় নি। কারণ, সরকারি রিপোর্টে প্রধান জোর বিদ্রোহীদের সামরিক প্রস্তুতির উপর।

গতবারের তুলনায়, এ প্রস্তুতি যে ছিল অনেক উন্নত ধরনের, এতে সন্দেহ নেই।[১০৮] এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ি গারোদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ স্থাপন করল। কারণ সম্ভবত দুটি। নূতন অঞ্চলে সংগঠনের বিস্তার বিদ্রোহীদের শক্তি-বৃদ্ধি করবে। সমতলের জমিদারদের সঙ্গে পাহাড়ি গারোদের দীর্ঘদিনের তিক্ত সম্পর্কের কথা মনে রেখেই হয়তো বিদ্রোহীরা এ ধরনের চেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয়ত, সংঘর্ষ যদি পাহাড়ি অঞ্চলেও ছড়ায়, তাহলে পাহাড়ের ভৌগোলিক প্রকৃতি সম্পর্কে গারো-দের জ্ঞান বিশেষ কাজে আসবে। সরকারি বিবরণে এও বলা হয়েছে, পাগল সৈন্যদলে "আসামের ভাড়াটে সৈন্যরা"ও আছে। খুব সম্ভবত গারো পাহাড়-সংলগ্ন আসামের কোনো-কোনো অঞ্চল থেকে পাগলরা বেশ খানিকটা সমর্থন পেয়েছিল। তা ছাড়া, তারা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্যও আগের থেকে অনেক বেশি প্রস্তুত ছিল। সরকারি বিবরণ অনুযায়ী, তিনশ বা চারশ জনের নানা দল বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিল; মূল বাহিনীতে ছিল প্রায় তিন হাজারের মতো পাগল; জোনাকি পাত্র তার অধিনায়ক; অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে অবশ্য নূতনত্ব নেই—বর্শা, ধনু, বিষমেশানো তীর, এবং কয়েকটা মাত্র বন্দুক। প্রয়োজন হলে অবশ্যই তারা রণকৌশল পরিবর্তন করত। যেমন, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে চাইলে, তারা গারো পাহাড়ের নানা অঞ্চলে সরে পড়ত। পাহাড়ি গারোদের সঙ্গে যোগাযোগ তখন খুবই কাজে এসেছিল।

উন্নততর প্রস্তুতি এবং নিপুণ সংগঠনের জন্যই বিদ্রোহীরা বড়ো অঞ্চল জুড়ে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। প্রথম বারের মতো, এবারও তাদের মূল লক্ষ্য নিজেদের রাজ-

নৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা।

বিদ্রোহীদের এ সংগঠিত শক্তি স্থানীয় প্রশাসন অকপটে স্বীকার করেছে।[১০৯] 'শেরপুর এবং গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল সম্পূর্ণ টাই তাদের দখলে। অধিনায়ক জোনাকি পাত্রের ঘোষণা, শেরপুরে শুধু-মাত্র তার কর্তৃত্বই মানা হবে; তার স্পর্ধা এতদূর গেছে যে, সে দূত মারফত এ অঞ্চলের এক প্রধান জমিদারকে হুকুম করেছে, যেন তাকে অর্থ পাঠানো হয়; যেন জমিদার একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার সামনে হাজির হয়; অন্যথা, তাকে শাস্তিভোগ করতে হবে; তার সম্পত্তি, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে।'[১০৯ক]

বস্তুত নূতন হারে খাজনা আদায় বহুদিন জমি-দারের পক্ষে সম্ভব হয় নি। জমিদারের পেয়াদাদের বিদ্রোহীরা পিটিয়ে গ্রাম থেকে বার করে দিত। পেয়াদাদের রক্ষার জন্য শেরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে পাঠান। বিদ্রোহীরা তাঁকে এবং তাঁর দলবলকে তোয়াক্কাই করে নি। এ রাজ-পুরুষের প্রতিবেদন: পাগলদের এমনই দুঃসাহস যে, আমার তাঁবুর পাশের গ্রামের এক তালুকদার ও তার ছয় পেয়াদাকে তারা ধরে নিয়ে গেছে, প্রায় পক্ষকাল তাদের পাহাড়ে আটকে রাখার পর। এক পেয়াদাসহ তালুকদারকে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে; অন্যদের কোনো খোঁজ এখনও নেই।[১১০] প্রায় বছর খানেক ধরে জমিদারের লোক গ্রামে ঢুকতেই পারছে না। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ পাঠিয়েও কোনো লাভ হয় না, অবস্থা বুঝে তারা সব সম্পত্তি নিয়ে পরিবারসহ পাহাড়ে পালিয়ে যায়। এক রাজকর্মচারী বেশ কয়েকটা 'বর্ধিষ্ণু গ্রাম' ঘুরে দেখেন, সেখানে উল্লেখ-যোগ্য কোনো সম্পত্তিই নেই; কারণ খাজনা আদায়ের জন্য পুলিশি ব্যবস্থা এড়ানোর জন্য তারা অন্যত্র সরে পড়েছে; ক্রোক করার মতো কোনো কিছুই সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু যেই না রাজকর্মচারী গ্রাম ছাড়লেন, অমনি আবার তারা 'স্ত্রী, সন্তান, গবাদিপশু ও জিনিসপত্র' নিয়ে ফিরে এল।

কিন্তু আগের বারের মতোই দীর্ঘদিন ব্রিটিশ সৈন্যদলের সঙ্গে তারা পেরে ওঠে নি। [ক্রমশ

সূত্র-নির্দেশ ও টীকা

৭৯. *"Translation of the Proceedings in two cases tried in 1847 before the Sessions Judge of Dacca in which Doodoo Miyan and 63 of his followers belonging to the Sect of Hajees or Ferazees were charged with wounding, plunder, Arson" etc.* (Calcutta 1848). Appendix P. I Dunlop বলে: 'From that time I became a marked man amongst them.'

৮০. একই।

৮১. একই; ডানলপের সাক্ষ্য (৩ অগস্ট ১৮৪৭)।

৮২. একই; পৃ ৩ [of the 'proceedings'] Petition of Bharut Chunder Roy, Mohurir of the Faujdaree Court of Furreedpore। রায় বলেন: 'Should any victim of their [Faraji's] tyranny, with a view to secure his property, seeks refuge with a Zemindar or any other influential man, they do not feel any scruple to injure the party who thus opposes them.....Mr. Dunlop and the Baboos, having resisted the introduction of the doctrines of the prisoner [Doodoo Meah] among the ryots, have been brought into collision with the prisoner.'

৮৩. একই; পৃ ৩১১; Fatwa of the Law Officer.

৮৪. Bengal Judicial Progs., 23 Jan. 1850, No. 61. Petition of 1 Jan., 1850.

৮৫. মরিসন (যিনি পাগলপন্থী আন্দোলনের উৎপত্তি, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন) নিম্নলিখিত গোষ্ঠীগুলির উল্লেখ করেছেন; গারো, হাজং, হাজি, ডালু, বোনাও (বানাই), বংশী এবং দাই। [Bengal Judicial Criminal Prog., 5 Jan., 1826, No. 39. মরিসন রিপোর্টের অনুচ্ছেদ ১১।

৮৬. একই।

৮৭. একই। 'ignorant and unlettered man'; Para 11.

৮৮. Q. Ahmad, *The Wahabi Movement in India* (Calcutta, 1966). পৃ ৫-৯; Muin-ud din Ahmad Khan, পূর্বোল্লেখিত; পৃ lxxix-lxxxii.

৮৯. (…'মুরিদদের কাছে নিঃসীম আনুগত্যের দাবি… গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার অন্যতম প্রকাশ মাত্র'—গৌতম ভদ্রের এ মত বিচারসাপেক্ষ (শাংদীয়া সংখ্যা "অনুষ্টুপ", ১৯৮৬, "'পাগলাই ধুম': ময়মনসিংহের কৃষক বিদ্রোহ". পৃ প্র ৫৩)।

৯০. গিরীন্দ্রনাথ দাস, "বাংলা পীর সাহিত্যের কথা" (বাসন্তী, ১৯৭৬), পৃ ২।

৯১. গৌতম ভদ্র, পূর্বোল্লেখিত (পাদটীকা ৮৯ দ্রষ্টব্য), পৃ প্র ৫৫।

৯২. মোহম্মদ জয়েন উদ্দীন, "করিম শাহ ও টিপু শাহ" (জালালপুর, ময়মনসিংহ, ১৩৩২, প্রথম সংস্করণ)।

৯৩. গৌতম ভদ্র, পূর্বোল্লেখিত; [পাদটীকা ৮৯ দ্রষ্টব্য]।

৯৪. ভদ্র নিজেও স্বীকার করেছেন, 'সমসাময়িক সাক্ষ্যের মূল্য গ্রন্থটির নেই' [পৃ প্র ৫৪]। পাগলপন্থী ঐতিহ্যের সামগ্রিক ইতিহাস হিসেবে এ বইয়ের মূল্য অপরিসীম। 'পাগলপন্থীদের ধর্মজগৎ ও তাদের অতীত বিদ্রোহের ঐতিহ্যকে তারা কি করে তাদের স্মৃতিতে ধরে রেখেছে', এ প্রসঙ্গেই গ্রন্থটির মূল্য। কিন্তু বহু আগের এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তের রূপ বোঝার জন্য এ "স্মৃতি" নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। এ স্মৃতি 'যৌথচেতনার ভাণ্ডার'; কিন্তু 'যৌথচেতনা' এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ; কোন্ কোন্ নূতন উপাদান এসে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তার নিপুণ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

৯৫. একই; পৃ প্র ৫৬-৫৭।

৯৬. মরিসনের রিপোর্ট, পূর্বোল্লেখিত, [পাদটীকা ৮৫ দ্রষ্টব্য], Para 11.

৯৭. গৌতম ভদ্র, পূর্বোল্লেখিত, পৃ প্র ৫৬।

৯৮. মরিসন রিপোর্টের অনুচ্ছেদ ১১।

৯৯. একই।

১০০. নানাভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হলেও মরিসনের দীর্ঘ রিপোর্ট এবং তাঁর সংগৃহীত অন্যান্য দলিলও পরিবর্তন বোঝার জন্য অপরিহার্য। কারণ বিদ্রোহের সমসাময়িক অন্য কোনো বিবরণ নেই। এসব উপকরণ পাওয়া যাবে Bengal Judicial Criminal Progs. 5 Jan., 1820; No. 5. 39-41. অন্যান্য চিঠিপত্র পরে উল্লেখ করব।

১০১. একই; মরিসন রিপোর্ট, অনুচ্ছেদ ৩৬-৬৪।

১০২. একই অনুচ্ছেদ: ৯ জানুয়ারি, ১৮২৫-এর এক পুলিশ রিপোর্ট মতে: 'The people refused to work for the Zamindar and say their caste is disgraced by working on the road and cutting grass for the horses'.

১০৩. একই: মরিসন রিপোর্ট; অনুচ্ছেদ ১২; বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সত্যিকারের কাঠের বন্দুক আদালতে দেখানো হয়েছিল; যেসব বিদ্রোহীর বাড়ি থেকে পুলিশ এসব বন্দুক উদ্ধার করে, তাদের কিন্তু সবারই বর্শা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র ছিল।

১০৪. একই; অনুচ্ছেদ ৩৩।

১০৫. একই; অনুচ্ছেদ ৩৪।

১০৬. Bengal Judicial Criminal Progs., 1 April 1825; No. 87; W. Dampier, Mymensingh Magistrate to Dacca Court of Circuit. 31 March 1825 বিদ্রোহীদের মুখে শুধু একটাই কথা—টিপু ছাড়া কারো শাসন তারা মানবে না। মার্চের (১৮২৫) মাঝামাঝি Dampier এসে এক হুকুমনামা জারি করে বলেন, কৃষকেরা যেন তাদের অভাব-অভিযোগ পেশ করে: সাদা কাগজে করলেও চলবে; বিদ্রোহীরা এর কোনো তোয়াক্কাই করল না। এক পুলিশ বরকন্দাজ, থানার তিন পেয়াদা, আর জমিদারের ছয় পেয়াদাকে আটকে রেখে দিল। বিদ্রোহীরা গ্রামে গ্রামে নির্দেশ পাঠাল: "none should pay revenue excepting to Tipoo Pagle whom they proclaimed their chief, and where any opposition or unwillingness was shown they proceeded indiscriminately to plunder." [অনুচ্ছেদ ২]।

১০৬(ক). একই; 'I considered that this position of the district was almost in a state of rebellion.' [অনুচ্ছেদ ২]।

১০৭. Bengal Board of Revenue Progs., 20 Aug., 1830; No. 33; Petition of some ryots of Pergunnah Sherpur and Alap Singh (no date).

১০৮. Bengal Judicial Criminal Progs., 13 May, 1833; Nos. 15-16.

১০৯. একই; Proceeding No. 16: ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট Dunbar লিখছেন (১ মে ১৮৩৩): "they have taken possession of the whole country between Sherpore and the Garrow Hills, and compel the ryots to pay contributions, made in the name of Jonakoo Parters who may be considered as their chief leader". [Para 2]

১০৯(ক). একই।

১১০. Bengal Judicial Criminal Progs., 22 Feb. 1833, No. 34, Dunbar to Dacca Commissioner, 8 Feb., 1833. Para 2.

শ্রীপতি ডোমের স্বদেশচিন্তা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিপতি ডোম—ভালো নাম শ্রীপতি কালিন্দী ('জাতে ডম গ—আমরা বলি কালিন্দী')—আমি যখন তাঁকে দেখি, তখন তাঁর বয়স কম করে সত্তর। শুকনো খটখটে বেলের মতো মাথাটায় চুলের একটা রেঁায়াও নেই, অথচ সারা মুখে ছুলের মতো সাদা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। গায়ে একখানা কালো তুষের চাদর—চাদরখানা সাপটে জড়িয়ে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন মানুষটি। কাঁপুনি দিচ্ছে থেকে-থেকে—বোধহয় জ্বর আসছে। বিকেল পড়ে আসছে। মরা, মিয়োনো আলো। সবেদাগাছের পাতা কাঁপিয়ে ঝিরঝিরে বাতাস। চাদরখানা আরও ভালো করে জড়িয়ে শ্রীপতি ডোম বসলেন একেবারে হাঁটুছুটো পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে।

—শুনেছি, আপনি নাকি স্বদেশীর গান গাইতেন? এখনও পারেন?

—টুকু পারি বটে।

শ্রীপতি ডোমের কাঠল মাথাটা ছুলে উঠল একবার; এমনভাবে ছুলল যেন সরু ডিগডিগে গলার ওপর স্প্রিঙ দিয়ে বসানো একটা বল নড়ে উঠল একবার। খেয়াল হল, মাথাটা ছুলছে, আর হুঁ-হুঁ করে একটা শব্দ বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে। ওটা যে গান নয়, জ্বর আসার আগের এক বিশিষ্ট গোঙানি, বুঝে নেওয়ার পর মনে হল, আর কথা বলানো উচিত হবে না লোকটিকে এ অবস্থায়। অগত্যা উঠে পড়ার কথাই ভাবতে হয়। ঘাড় তুলে সবেদাগাছটা একবার দেখি, তারপর বলি—আসি তাহলে আজ।

—ছুস! কথা ত শুরুই হল না গ।—শ্রীপতি ডোম সখেদে হেসে উঠলেন, তারপর লম্বা হাতটা হাপরের মতো একবার তুলে এমনভাবে নামিয়ে রাখলেন, যার অর্থ: বোসো—বসে পড়ো।

দূর দিয়ে উড়ে গেল কয়েকটা শামুকখোল। খুব গলা ছেড়ে গান ধরেছে এক বাগাল ছোঁড়া। এত দূর থেকেও শোনা যায়, আর চারপাশে অন্য কোনো শব্দ নেই বলে ওটাই এখন এ মুহূর্তের একমাত্র ধ্বনি হয়ে

যায়।

তাকিয়ে দেখি, শ্রীপতি ডোম মাথাটি তেমনি নীচু করে রেখে থেকে-থেকে গোঙিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর ছুটো হাতই চাদরের মধ্যে ঢোকানো। পাছুটো সেঁধিয়ে আছে পেটের মধ্যে।

—একটা গান যদি শোনাতেন!

আবার মাথা ছুলে উঠল। হুঁ-হুঁ শব্দটা ফিরে এল আবার। চোখছুটো বোজা রেখে শ্রীপতি ডোম টেনে-টেনে বললেন, কী হবে—কী হবে উসব শুনে?

শ্রীপতি ডোম মাথা নাড়িয়ে যাচ্ছেন। শুকনো চামড়ার তলা দিয়ে ভেতরের শিরগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। এক লহমার জন্যে সত্যি-সত্যিই বোবা হয়ে যাই তাঁর প্রশ্নে! কী হবে? পঞ্চাশ বছর আগে কোন্ গাঁয়ে কোন্ ডোম স্বদেশীর গান গাইত, তা কার কী কাজে লাগবে আজ? স্বদেশীর গানে এখন আর প্রাণিত হয় না কেউ। সেই গান শুনে আজ কেউ ন্যায়ের দণ্ড নেমে আসছে বলে অত্যাচারীকে সাবধান করে দেবে, কি জগৎজনের শ্রবণ জুড়িয়ে মা বলে ডেকে উঠবে একবার—ভাবাই যায় না। আর শ্রীপতি ডোমের গানের খুব মহৎ সাহিত্যগুণ আছে, এমন সম্ভাবনাও কম। সুতরাং কী মূল্য থাকতে পারে তাঁর গানের?

বসেই পড়লাম। চারপাশে বাচ্চারা অসীম কৌতূহল নিয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে। অস্বস্তি লাগে। নতুন করে কথা শুরু করার ভঙ্গিতে বলি, মল্লিকবাবু তো আপনাদের গ্রামেই থাকতেন?

শ্রীপতি ডোম ঘাড় নাড়লেন। অর্থ: হ্যাঁ। এটা অবশ্য কোনো নতুন তথ্য নয় আমার কাছে। এইসব জেনেশুনে নিয়েই আমি এই মানুষটির কাছে এসেছি। আসার পথে চৌকো একটা মাটির ঢিবির দিকে আঙুল দেখিয়ে গ্রামের একটি যুবক বলে দিয়েছিল—মল্লিকবাবুর নামে ইটা আমরা বনায়েছি। উয়ার জন্মদিনে ইখানে মেলা হয়—গান হয়—পিদিম দি আমরা—পোস মাসে—আসবেন একবার—

মল্লিকবাবু সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা নেই আমার। কিন্তু মাটির ঢিবির ওই স্মৃতিচিহ্নটির দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল, এই যেন যথার্থ স্মারক হয়েছে মানুষটির। এমন এক গ্রামে শ্রীপতি ডোমের মতো লোককে স্বদেশীতে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন যে-মানুষটি, তাঁর স্মৃতিচিহ্ন যেন এমনই হবার কথা। ফি-বছর পোষ মাসে এই মাটির ঢিবিটি গাঁদাফুলে সাজিয়ে দেওয়া হয়, তার মাঝে জ্বলজ্বল করে কয়েকটি স্মৃতির প্রদীপ আর সত্তর বছরের বুড়ো শ্রীপতি ডোম ঢোল বাজিয়ে গায়—কী গায় আমার জানা নেই—তবে ধরে নিতে পারি সে গান স্বদেশীরই—পঞ্চাশ বছরের ঘাসমাটি ঝেড়ে মাটির বুকের ভেতর থেকে তুলে আনা কোনো গান—এরকমই তো হবার কথা।

আমি আবার শ্রীপতি ডোমের দিকেই ফিরি, আর পুরনো কথাটাই আর-একবার বলি—আপনার একটা গান শোনার ইচ্ছে ছিল।

শ্রীপতি ডোম এবার হু-হু করে হেসে ওঠেন—উসব গান আর মনে লাই, বাপ—ভুলা গেছি সব।

এতক্ষণের মধ্যে তাঁর এই হাসি আর ক্ষণেকের জন্যে গাল-ফুলে-ওঠা মুখটার দিকে চেয়ে খুব আশকারা পেয়ে যাই; ওঁকে থামতে না দিয়েই বলি—আপনি কি ছোটোবেলা থেকেই গান গাইতেন?

—গাওয়া হত। লাচ-ও হত।

—নাচ!

—হ্যাঁ গ! ঝুমুর—দাঁড়সাল ঝুমুর—বুঝ?

খুব একটা বোঝা না থাকলেও এখন আমাকে দারুণ একজন সমঝদারের ভাণ করতে হয়। হাঁ-হাঁ করে বলি নিশ্চয়ই—তারপর—

—মল্লিকবাবু শীতলপুরের মেলায় লাচ দেখল। রাতভর লাচ। দেখে বুললে—তু স্বদেশীর গান কর ছিপতি—তুর মধ্যে একটা আগুনের পারা ভাব আছে—উটাকে জাগাতে হবেক।

প্রায় খিলখিল করেই হঠাৎ হেসে উঠলেন শ্রীপতি ডোম এই জায়গাটায়। বুঝতে পারছি না এর মধ্যে

কোথায় হাসির উপাদান লুকোনো আছে। বুড়ো দাদুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে কয়েকটি বাচ্চাও এখন হাসতে শুরু করে দিয়েছে। হাসি থামলে বলি—কী গান গাইতেন?

—মল্লিকবাবুই লিখা করত। বড় ভাল গান বাঁধা করত উ লক।

—সে-সব গান কিছু মনে নেই এখন?

—লাই গ বাপধন—লাই।

মনে হল, হঠাৎ যেন ঝিমিয়ে গেলেন শ্রীপতি ডোম। মাথাটা ঝুঁকে এসে প্রায় হাঁটুর ওপর ঠেকেছে। পাতলা একটা ধাতুর পাতকে এলোপাতাড়ি পিটে গেলে যেমন হয়, ঠিক সেরকম দেখাচ্ছে তাঁর মাথার তালুটা। সন্ধে নেমে গেছে। খুব কালো-ধোঁয়াওলা একটা কুপি বসিয়ে দিয়ে গেল একটি মেয়ে। শ্রীপতি চোখ ফাঁক করে একবার দেখলেন, তারপর চাদরের ভেতর থেকে হাতদুটো বের করে জোড়া করলেন—কোন্ দেবতার উদ্দেশে জানি না।

হুঁ-হুঁ শব্দটা জোর হয়ে উঠেছে আবার। ঠিক মনে হচ্ছে, শ্রীপতি ডোম যেন মনে-মনে একটা সুর ভেঁজে নিচ্ছেন। এক্ষুনি যেন শুরু করবেন 'শুন' বলে। সে গানের ভাষা কী হবে আমি ভাবতে পারছি না। খুব উদ্ভট শোনাচ্ছে জেনেও বলি, স্বদেশী ব্যাপারটা বুঝতেন?

—ওই মল্লিকবাবুই বুঝাতেন।

—কী বলতেন?

—কত কী বুলতেন। —শ্রীপতি ডোম শুরু করেও থেমে গেলেন হঠাৎ। এইবার স্থিরনিশ্চয় হয়ে গেছি, তিনি মনে-মনে কিছু বলছেন। মুখটা একটু এগিয়ে নিয়ে বলি, কিছু বলছেন?

—বুলছি ত!

—হ্যাঁ বলুন—মল্লিকবাবু কী বলতেন?

—বুলতেন গাঁধিজী বুলেছেন—আর তুদের কেউ ডোম বুলে ছুটো করবেক লাইরে, ছিপতি।

—আর কী বলতেন?

—সুবাসবাবুর কথা বুলতেন। কত বড় লেতা ছেলান তিনি। খুদিরামের কথাও বুলতেন। বড় ভালো গান লিখা করাছিলেন খুদিরামের নামে। দমে গাওয়া হত বটে।

শ্রীপতি ডোম এখন সমানে বিড়বিড় করে কিছু বলে যান নিজের মনে। মাঝে-মাঝে একটা-দুটো কথা আমি শুনতে পাই। সেগুলো মোটামুটি জোরে, যেন আমাকে শোনানোর জন্যেই। আর যখন তিনি নিজের মনে কথা বলছেন—প্রায় দুর্বোধ্য সে স্বর—শ্রীপতি যেন চাইছেন না আমি তাঁর সেই আত্মমগ্ন কথনের মধ্যে প্রবেশ করি। মনে হয়, পঞ্চাশ বছরের পুরনো ইতিহাসটিকে তিনি যেন জড়ানো পটের মতো একটু-একটু করে ভাঁজ খুলে নিচ্ছেন আর মাঝে-মাঝে একটা করে ছবি মেলে ধরছেন আমার সামনে···

মল্লিকবাবু ক্ষুদিরামের কথা বলতেন, গান্ধিজীর কথা বলতেন, সুভাষচন্দ্রের কথাও বলতেন। গান্ধিজী বলেছেন হরিজনেরা মন্দিরে ঢুকবে, পুকুরের জল নেবে। সুভাষচন্দ্র বলেছেন—তোমরা দেশের জন্যে রক্ত দাও; আর দুর্জয় সাহসী ক্ষুদিরাম—সায়েবরা উয়াকে হিলাতে লারল—উয়ার ফাঁসি দিল···শ্রীপতি ডোম হয়তো এইরকমই কোনো এক সন্ধ্যায় ধোঁয়া-ওঠা কুপির আলোয় বসে মল্লিকবাবুর মুখে শুনে থাকবেন এসব কথা। মল্লিকবাবু মাস্টার ছিলেন। পড়াশোনা করতেন কত। শহরে গেলে কাগজ নিয়ে আসতেন, তারপর সকলকে ডেকে পড়ে শোনাতেন কাগজের খবর আর বলতেন—কী বলতেন?

—বুলতেন, দেশের লকের মধ্যে কোন একতা ভাব লাই, ছিপতি—ভায়ে-ভায়ে হানাহানি করে।

শ্রীপতি ডোম বলতে-বলতে ভাবনায় তলিয়ে যান। আমি মনে-মনে ইতিহাসটাকে একটু সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করি। মল্লিকবাবু এইসব কথা বলতেন বোধহয় তিরিশের দশকের গোড়ায়। পৃথক নির্বাচন-মণ্ডলীর দাবি নিয়ে তখন কংগ্রেস-লীগে দারুণ মনকষাকষি। সেই সাম্প্রদায়িক মনান্তর নিশ্চয়ই

ব্যথিত করেছিল মল্লিকবাবুকে। তাঁর অন্তরের সেই ব্যথার কথাই তিনি শুনিয়েছিলেন শ্রীপতিকে। কিন্তু তারপর—তারপর কী হল?

—সুবাসবাবুকে দেখলম গ!

—দেখলেন? কোথায়?

—শ্রীপতি এ কথায় মিটিমিটি হাসেন, আর বলেন, সিটি বড় মজার কথা গ।

মজার কথাই বটে। সুভাষচন্দ্রকে দেখতে ন মাইল পথ ঠেঙিয়ে শ্রীপতি ডোম হাজির হয়েছিলেন স্টেশনে। শোনা গিয়েছিল, ওই ট্রেনে সুভাষচন্দ্র আছেন। ট্রেন এল, দাঁড়াল না; শুধু একটি কামরায় পতাকা বাঁধা ছিল—অন্য অনেকের মতো শ্রীপতি ডোমও সেই পতাকাটির দিকে চেয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন সুভাষবাবুর। সেসব কতদিনের কথা! শ্রীপতি ডোম চঞ্চল হয়ে ওঠেন হঠাৎ, তারপরই শুকনো মাথাটা নাড়িয়ে হায় হায় করে ওঠেন—মল্লিকবাবু বুললে, সব বোনাশ হয়্যা গেছে ছিপতি, সুবাসবাবু চল্যা গেছে—কুথা গেছে—কুনো ঠিক লাই—

ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়ে গেছে। যতীন দাস না খেয়ে জেলের মধ্যে মরেছে—তার শবদেহ নিয়ে সুভাষচন্দ্র যখন কলকাতায় পৌঁছলেন সে কী দৃশ্য—মল্লিকবাবু কাগজে পড়েছেন সে কথা; সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানে বিহ্বল মানুষটি এখন তাঁর মনের সব দুঃখ উজাড় করে দিচ্ছেন শ্রীপতি ডোমের কাছে।

ইতিহাসের ছিন্ন, অবিন্যস্ত সূত্রগুলো কেমন আপনা হতেই গ্রথিত হয়ে যায়। মল্লিকবাবু গান্ধিজীর ভক্ত; আবার সুভাষচন্দ্রও তাঁর নেতা; অন্যদিকে ক্ষুদিরাম-যতীন দাসের জন্যেও হাহাকার করেন তিনি। হয়তো এরকমই হয়ে থাকে। ইতিহাসের পাঠ্য বইয়ে নরম আর চরম ভাগ দুটো যেরকম কাটা-কাটা করে দেখানো হয়ে থাকে, জীবনে—মল্লিকবাবুদের মতো মানুষের বেলায় বোধহয় ঠিক সেরকমটা ঘটে না।

ভাবতে-ভাবতে এতক্ষণে খেয়াল হয়, শ্রীপতি ডোম ঢুলছেন। হয়তো ঘুম আসছে। কিংবা হয়তো জাঁকিয়ে জ্বর এসে গেছে এতক্ষণে। আর উচিত হবে না লোকটিকে বসিয়ে রাখা। উঠে পড়ব ভেবেও হঠাৎ বলি—এসব কথা শুনে কী মনে হত আপনার?

—কী কথা?

—এই দেশের এত দুর্দিন—এইসব—

—মনে বড় আকতা হত—প্রাণটা দুখাত—মনে হত—বড় অভাগা বটে আমরা—লিজের দেশটি বিকাইন দিলম—ধিক রে—ধিক রে···শ্রীপতি ঘন-ঘন মাথা নাড়াতে-নাড়াতে কিছু বলতে লাগলেন। তাঁর গলার স্বরটা ক্রমশ নেমে আসছে। আমি ভালো করে শুনতে পাচ্ছি না; কিন্তু বেশ বুঝতে পারি—তিনি কিছু বলছেন—কানটা প্রায় তাঁর মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি আর শুনতে পাই—ধিক্ রে—ধিক্ রে—

···ধিক্ রে বাঙ্-আ-ল-ই-ই—তর মুখে কালি—লিজের স্বদেশ—তুই পরের হাতে দিলি-ই-ই···

শ্রীপতি ডোম গান গাইছেন। পাদুটো পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে কুঁজো হয়ে বসে থাকা, ন্যাড়ামাথা ওই লোকটিকে দেখে বোঝার উপায় নেই; কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তাঁর গান। অর্ধ শতাব্দীর গহ্বর থেকে ঘাসমাটি-শেকড়বাকড়ের গন্ধসমেত উঠে আসছে সেই গান: ধিক্ রে বাঙালি—তোর মুখে কালি···

ঝিঁঝিতে ঝমঝম করে ঘুঙুর বাজায়। অন্ধকারে লক্ষ জোনাক জ্বলে। শ্রীপতি ডোমের মাথাটি ঝুঁকে এসে তাঁর দুই হাঁটুর জোড়ের ওপর ঠেকে।

২

—স্বাধীনতার দিনটার কথা মনে পড়ে আপনার?

—লাই গ!

—কিছু মনে নেই?

—টুকু আছে বটে। গাঁধিজীকে গুলি করা মারল। মল্লিকবাবু কানতে-কানতে বুললে, সাপ রে ছিপতি—

কালসাপে গুশাইছে গাঁধিজীকে।

বুঝতে পারি, শ্রীপতি ডোমের স্মৃতিবিভ্রম ঘটে যাচ্ছে। পরের ঘটনা আগে এসে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও আমি তাঁর মুখ থেকে সাতচল্লিশের সেই দিনটির কথা বের করে আনতে পারি না। শ্রীপতি কখনও সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের কথা বলেন, কখনও গান্ধীজীর মৃত্যুর কথা বলেন, কখনও বা দাঙ্গার কথা শোনান।

—মল্লিকবাবু বুললে কলকাতায় ভায়ে-ভায়ে কাটাকাটি হচ্ছে—বড় কঠিন দিন আইসছে ছিপতি—ভাই ভায়ের রক্ত ফেলাছে—

—সুবাসবাবু কী কইরছেন?

—ওঁয়ার কথা কেউ জানে না, বাপ। তিনি চলা গেছেন।

—গাঁধিজী কী কইরছেন?

—তিনি উপাস দিছেন। বুলছেন—ইসব হানা-হানি চইলবেক ত আমি না খায়ে মইরবেক।

শ্রীপতি ডোমের মাথা ঘুরে যায়। সাহেবরা চলে গেল। ইস্কুলবাড়িতে মাস্টারমশাই পতাকা তুললেন। ছেলেরা কত গান করল। আর এদিকে মল্লিকবাবু বলছেন, কলকাতায় ভায়ে-ভায়ে কাটাকাটি করছে—ইসব কি হইচ্ছে বটে?

শ্রীপতি ডোম কঠিন সমস্যায় পড়ে যায়। নানা-রকম কথা শোনা যাচ্ছে। কেউ বলে, জমিদারি উঠে যাচ্ছে—এখন জমি যাবে চাষাদের হাতে। আর-একজন বলে, ভুস, তেভাগা চেয়েছিল বলে সব রক্তগঙ্গা করে দিয়েছে। কেউ শোনায়, কলকাতায় চাল নেই, তেল নেই—কয়লার অভাবে হাঁড়ি চড়ছে না বাবুদের ঘরে। খুব মুরুব্বি গোছের কেউ-কেউ আবার বলে—সব ছারখার হয়ে যাবে—জাপানি বোম এই পড়ল বলে···। শ্রীপতি ডোমের সব গোলমাল হয়ে যেতে থাকে। সে তখনও একলা পথে তার বড়ো প্রিয় গানটি 'ধিক্‌রে বাঙালি' গাইতে থাকে আর খেয়াল করতে পারে, দিনকাল বদলে যাচ্ছে। হালদারবাবু—উয়ার পারা হারাম ছুটা দেখি লাই—সেই হালদারবাবু কিনা নেতা হয়ে গেলেন। মাথায় সাদা টুপি পরে ভাষণ দেন এখন।

শ্রীপতি ডোমের মনে পড়ে, শেষের দিকে মল্লিক-বাবু কেমন পাগলের পারা হয়ে গিয়েছিলেন। কেউ কিছু বলতে গেলেই তাড়া দিয়ে বলতেন—হালদার-বাবুটিরে বুল কেনে—উনি এখন তমাদের লেতা বটে।

—উয়ারে আমি চিনি লাই, বাপ। তুমার কথা বল।

মল্লিকবাবু তাই শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন—আমি হন্তু কি—আমি হন্তু কি রে ছিপতি—হালদার-বাবুটিরে ছ্যাখ কেনে—উ লোক পাকা আঁবটি হয়াছে বটে।

মল্লিকবাবুর শেষ দিনগুলি বড়ো দুঃখে কেটেছিল। মেদিনীপুরে না কোথায় যেন যে-দারোগা মেয়েদের ওপর অত্যাচার করেছে—তারই কিনা প্রমোশন হয়েছে স্বাধীন ভারতে—তাই শুনে মল্লিকবাবু যে-রকম লাফঝাঁপ করেছিলেন আর 'ঝুট ঝুট' বলে চিৎকার করেছিলেন, তাতে অনেকেই জেনে গিয়েছিল—লোকটি পাগল হয়াছে বটে। এইরকম আধপাগল অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীপতি ডোমের মুখে এইসব কথা আমি শুনি তাঁরই ঘরে বসে, দু-কান-জোড়া ঝিঁঝিঁর ঝমঝম নিয়ে, আর গ্রামের যে পরিবারটিতে আমি অতিথি হয়েছি, রাতে তাদের কাছে জানতে পারি, শ্রীপতি ডোমকেও সকলে আধপাগল বলেই জানে। তার একটি ছেলে কিছুকাল আগে হঠাৎ মারা গেছে। আর-একটি মুনিষ—মজুরি খাটে। আর শ্রীপতি গাঁয়ের বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষে করে। বছর কুড়ির এক সাফর যুবক আমাকে কথাটি বুঝিয়ে দেয় এইভাবে: গাঁয়ে তো ভিখিরি বলে কিছু নেই—তা উনি স্বভাবে করে। আমরাও দি যা পারি। ও লোকের মাথাটি খারাপ হয়া গেছে।

শ্রীপতি ডোমের মতো মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়; ফলে ছেলেটির কথায় অবিশ্বাস

করার মতো কিছু পাই না। বাস থেকে নেমে এই গ্রামে পৌঁছনোর পথে শীর্ণ একটা নদীর ধারা দেখে এসেছিলাম। চারপাশে কালো, বাদামি নুড়ি-পাথরের টুকরো, আর তার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সরু একটা জলের রেখা। ওটা যে নদী, বলে না দিলে জানবে না কেউ। মনে হবে, বহুকাল ধরে অনেক নুড়ি-পাথর জড়ো করেও আটকানো যায় নি ধারাটাকে।

রাতে শুয়ে বারবার সেই নদীটার কথাই মনে পড়ে।

৩

ভেবে রেখেছিলাম, পরের দিন ফিরে যাবার আগে শ্রীপতি ডোমের সঙ্গে একবার দেখা করে যাব। কে জানে, হয়তো জ্বরের তাড়সে কাতর হয়ে আছেন মানুষটি। আধঘণ্টা সময় হাতে রেখেই বেরোই আর শিম-শশা-শাঁখালুর খেত পেরিয়ে সরু যে পথটা চলে গেছে শ্রীপতি ডোমের ঘরের দিকে, সেই পথের মুখেই দেখা হয়ে যায় তাঁর সঙ্গে। গায়ে সেই কালো তুষের চাদরটি জড়ানো; মাথা অব্দি মুড়ি দেওয়া এখন। আশ্চর্য হয়ে দেখি, জ্বরের কোনো লক্ষণ আজ তাঁর দেহে নেই; কিন্তু অদ্ভুত ঘোলা দেখাচ্ছে চোখ-দুটো আর হাঁ-মুখটা এমনভাবে ফাঁক হয়ে আছে যে, মনে হয়, তিনি হাসছেন।

শ্রীপতি ডোম গুটিগুটি হেঁটে যাচ্ছেন। ঠিক হাঁটছেন না, যেন নাচছেন, নিজেরই পা ফেলার তালে-তালে; আর স্পষ্ট শুনি গুনগুন করে গাইছেন সেই গান: ধিক রে বাঙালি-ই···

দুটো হাত জোড় করে বলি—আসি।

শ্রীপতি ঘোলা চোখে একবার আমার দিকে তাকান। আমি ওঁর একটা হাত চেপে ধরে বলি—শরীর ভালো আছে তো?

এই সময় দূরে খুব জোরে মৃদঙ্গ বেজে ওঠে। প্রভাতী দিতে বেরিয়েছেন গ্রামের একমাত্র বৈষ্ণব মানুষটি। সে গানের শব্দও ভেসে আসে। শ্রীপতি ডোম হা-হা করে হাসেন আর মাথা নাড়িয়ে-নাড়িয়ে বলেন, ভিখ মাঙছি—দুটা আগড়া ধান ভিখ মাঙছি—বুঝ? ধিক্ রে বাংগালি—বাংগালি লয় গ—কাংগালি—ধিক্ রে কাংগালি-ই···

মৃদঙ্গের শব্দ তাঁর গানের ওপর আছড়ে পড়ে। সারা মুখের কুঞ্চিত বলিরেখায় এক মিথ্যা হাসির মায়া জাগিয়ে রেখে শ্রীপতি ডোম নাচতে-নাচতে আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে যান—একবারও ফিরে তাকান না।

পেরেসত্রোইকা এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্নবায়নের সমস্যা

অজিত রায়

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে মুদ্রিত রচনাটি লেখকের একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের কিছুটা সংক্ষেপিত রূপ। প্রবন্ধটি লেখক নয়া দিল্লির ইনসটিটিউট অব সোস্যাল সায়েন্সেস-কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনাসভায় উত্থাপন করেন এই বছরের ১৭ সেপটেম্বর তারিখে।

রচনাটির ভূমিকায় লেখক যা বলেছেন, পাঠকদের সুবিধার জন্য তার কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে উত্থাপন করা হল।

আশির দশকের শুরু থেকে সোভিয়েত অর্থনীতি কঠিন সংকটের মধ্যে পড়েছে। গোরবাচেভ বলেছেন, 'ধাতু, আলানি, সিমেন্ট, যন্ত্রপাতি, ভোগ্যপণ্য —সব-কিছুরই ঘাটতি ছিল এবং আছে।' তার সঙ্গে যোগ হয়েছে লোকবলের স্থায়ী ঘাটতি। 'সবচেয়ে আশঙ্কাজনক ব্যাপার হল, আমরা বৈজ্ঞানিক-প্রাযুক্তিক বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছি। .....তেল এবং কাঁচামাল রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়, অর্থনীতিকে আধুনিক করে তোলার পরিবর্তে তা প্রধানত চলতি সমস্যার সমাধান করতেই ব্যয় হয়ে যায়।'

এই আর্থনীতিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সোভিয়েত দেশের মানুষের নৈতিক সংকট বা জীবনাদর্শের সংকট। সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজস্বের একটি বড়ো উৎস অ্যালকোহলিক পানীয়ের উপর বসানো কর। এই ঘটনা কেবল অর্থ-নৈতিক নয়—রাজনৈতিক দুর্বলতারও সূচক। জনসমাজের একটি বড়ো অংশের প্রচণ্ড মদ্যাসক্তির অর্থ—তারা বিচ্ছিন্নতাবোধে আচ্ছন্ন। ধর্মবিশ্বাসের তাৎপর্য সম্বন্ধে মার্কসের অভিমত যদি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত না হয়, তবে বুঝতে হবে—সোভিয়েত দেশে কী কারণে ধর্মাচরণ বেড়ে যাচ্ছে। এক সোভিয়েত পত্রিকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৬৬ সালে ১০,২৬১ জন স্থলে পড়ার বয়সের ছেলেমেয়ের ধর্মদীক্ষা (ব্যাপটিজম) হয়েছিল; ১৯৮৬ সালে সেই সংখ্যা ৪০,৪৬৯ (কুড়ি বছরে চারগুণ বৃদ্ধি)। এই কুড়ি বছরেই গির্জায় গিয়ে বিবাহের সংখ্যা ৬০,৫১৫ থেকে বেড়েছে ৭৯,৮৪০-এ; ধর্মসম্মত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সংখ্যা ৮,৪৮,৫০৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১,৭৯,০৫১।

এই সর্বব্যাপক গভীর আর্থনীতিক এবং নৈতিক সংকট থেকে সোভিয়েত দেশকে তথা সোভিয়েত মানুষকে উদ্ধার করার লক্ষ্যেই পেরেসত্রোইকার কর্মসূচি নিয়োজিত। পেরেসত্রোইকা আর্থব্যবসার পুনর্বিন্যাস চায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস চায়, মানুষের ভাবজগৎ এবং নৈতিক জীবনেরও সমুন্নতি চায়।

—সম্পাদক

১

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আর্থনীতিক সংস্কারে ব্যক্তিক স্তরে উৎসাহদান এবং ব্যক্তির বৈষয়িক অর্জনের উপর বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে; এবং মুনাফা, বাজার, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কতকগুলি মূলধনতান্ত্রিক উপাঙ্গ বা ক্যাটিগরির প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে আমরা দোষ দেখি না। কেবল মূলধনতান্ত্রিক উপাঙ্গই নয়, এমন-কী মূলধনতান্ত্রিক সম্পর্কের কিছু-কিছু প্রবর্তনও তত্ত্বের দিক থেকে অননুমোদনীয় বিচ্যুতি নয়। তার কারণ, প্রথমত, মার্কসেরই নিজের কথায়, সমাজতান্ত্রিক পর্ব হল মূলধনতন্ত্র থেকে সাম্যতন্ত্রে উত্তরণের কাল—এই পর্বে দুটি পরস্পর-বিরোধী সমাজবিন্যাসের উপাদানগুলিই সহ-অবস্থান করে, এবং পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে (কার্ল মার্কস, "ক্রিটিক অব দ্য গথা প্রোগ্রাম")। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকভাবে এই ঘটনা লক্ষ করা গেছে—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে, বিকাশের বর্তমান স্তরে—অর্থাৎ, বৈষয়িক সমৃদ্ধির এই মাঝারি ধরনের উন্নতির পর্বে, এবং সামাজিক চেতনার বিদ্যমান অবস্থায়—যথোপযুক্ত বৈষয়িক উৎসাহদানের অভাব শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির ক্রমোন্নতির পথে কার্যত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পটভূমিতে, বাস্তবত নির্ধারক, চূড়ান্ত কর্তব্য হল—এক দিকে মূলধনতন্ত্রের বিদ্যমান এবং সম্ভাব্য উপাদানগুলি এবং অন্য দিকে সাম্যতন্ত্রের উদীয়মান উপাদানগুলির মধ্যেকার বিরোধগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তীব্রতর করে তোলা—যাতে সাম্যতন্ত্র দ্বারা শেষ পর্যন্ত মূলধনতন্ত্রের স্থান গ্রহণ করার ভিত্তি রচিত হতে পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আর্থনীতিক নীতির ব্যাখ্যানে এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যের উপলব্ধি সর্বাংশে নেই। যেমন, ১৯৮৭ সালের ২৫-২৬ জুনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে আর্থনীতিক পুনর্বিন্যাসের রিপোর্টে গোরবাচেভ বলেছেন,

> উৎসাহদানের সম্ভাবনা নাটকীয়ভাবে বিস্তার লাভ করছে। কিন্তু, প্রত্যেক শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি শেষ-ফলে তাঁর ব্যক্তিগত শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হবে, এবং এক্ষেত্রে কোনো সীমারেখা টানা হবে না—এই বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করছে। ন্যায়বিচারের একটিমাত্র নিরিখ থাকবে: আয় সৎভাবে উপার্জিত হয়েছে কিনা। ("পার্টির কর্তব্য প্রসঙ্গে", পৃ ৫৯, ফাঁকা অক্ষরবিন্যাস লেখকের।)

সীমাহীন ব্যক্তিগত অর্জনের এই প্রতিশ্রুতি কতকটা একপেশে—'নিজেকে ধনী করে তোলো': বুখারিনের সেই পুরনো স্লোগানের প্রতিধ্বনির মতো শোনায়। একটি মৌলিক সত্য হল এই যে, উৎপাদক শ্রমে একজন সোভিয়েত বা অন্য কোনো নাগরিক যে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রয়োগ করে, যে ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রকাশ ঘটায়, সেসব সামাজিক কাঠামোরই ফল, সামাজিক কাঠামোই তার ভিত্তি। এই মৌলিক সত্যটিকে বিচারে আনা হয় নি। সুতরাং, তার নৈপুণ্য, সংকীর্ণ অর্থে, প্রাকৃতিক বা তার ব্যক্তিগত-ভাবে আয়ত্ত গুণ নয়। (দ্রষ্টব্য: কার্ল মার্কসের "রবিন-সনেড"-এর সমালোচনা—অর্থাৎ, রবিনসন ক্রুশোর প্রাক্তন সামাজিক জীবনে অর্জিত জ্ঞান এবং নৈপুণ্যের কথা চিন্তা না করে, জনবসতিহীন ভূখণ্ডে তার কৃতিত্বের যে প্রশংসা করা হয়, তার সমালোচনা। *Grundrisse*, পেলিক্যান, ১৯৭৩, পৃ. ৮৩-৪)।

তা ছাড়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান আর্থ-নীতিক সংস্কার পেরেসত্রোইকার সঙ্গে আঙ্গিকভাবে যুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে; আর পেরেসত্রোইকা তো সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলিকে আরও গভীর, আরও সমৃদ্ধ করে তোলার কর্মসূচি—শ্রমজীবী মানুষের সমাজপরিচালনায় গণতান্ত্রিক যোগদানের বিস্তার-সাধনের উপরই এই কর্মসূচির রূপদান সম্ভব। ব্যক্তি-গত অর্জনের লোভ যদি শ্রমজীবী মানুষকে উৎপাদক শ্রমে দীর্ঘ সময় বেঁধে রাখে—চুক্তিবদ্ধ গৃহস্থ এবং

সমবায় সমিতিগুলির ক্ষেত্রে এইরকম হওয়ারই সম্ভাবনা—তাহলে, এইসব ক্ষেত্রে জনসাধারণের যে অংশ কাজ করবেন, তাঁদের পক্ষে সমাজের সাধারণ প্রশাসন-কাজে যোগ দেওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। আনদ্রোপভ এই বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> ···দেখা গেছে, যে মানুষকে কঠিনশ্রমসাধ্য, কঠোর দৈহিক শ্রম করতে হয় না, তিনিই তাঁর নির্দিষ্ট কাজের প্রতি অনেক বেশি উদ্যোগী এবং দায়িত্বশীল মনোভাব দেখান। তিনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে, উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় যোগদানের অতিরিক্ত সুযোগ পান। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমজীবী মানুষকে যে অধিকার দিয়েছে—তাঁদের সমাজের, তাঁদের রাষ্ট্রের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকার—সেই রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক অধিকার তিনি আরো পরিপূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। (ওয়াই. ভি. আনদ্রোপভ, "স্পীচেস আর্টিকল্‌স্, ইনটারভিউজ", অ্যালায়েড পাবলিশার্স, নয়া দিল্লি, ১৯৮৪, পৃ. ২০৩।)

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একসপ্ততিতম বছরে, কিছু-কিছু বৈষয়িক উৎসাহদানের সঙ্গে-সঙ্গে সোভিয়েত নাগরিককে সব সময় তাঁর রাজনৈতিক তথা সামাজিক দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিতে হবে। ১৯৮৭ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে গোরবাচেভ নিজেই তাঁর বক্তৃতায় যেসব উদাহরণ দিয়েছেন, সেগুলির থেকেই বোঝা যায় যে, এটা সম্ভব। তিনি গুম্‌স্‌ক্‌ অ্যামালগ্যামেশনস-এর কথা বলেন। তাদের উৎপন্ন 'অত্যন্ত উচ্চ মানের এবং অন্যদের তুলনায় অন্তত ৫০% বেশি লভ্য।' গত ২০ বছর ধরে অ্যামালগ্যামেশনস যোগানের একটি চুক্তিও ভাঙে নি, 'এবং অন্যদের তুলনায় মজুরি-বৃদ্ধি বা সামাজিক ক্ষেত্রে কোনো সুযোগবৃদ্ধি ছাড়াই এরা এটা করেছে।'

দ্বিতীয়ত, বৈষয়িক সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে জীবন-যাপনের মানের উন্নত উপলব্ধির দ্বারা সংশ্লেষিত করতে হবে। এই ক্ষেত্রেও, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্বের তুলনায় আনদ্রোপভ সমস্যাটির উন্নত এবং অনেকটা সুসমঞ্জস উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> 'জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন' কথাটি আমাদের দেশে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কখনো-কখনো কথাটিকে সাদামাটাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। তখন চিন্তায় থাকে কেবল জনসাধারণের আয়বৃদ্ধি এবং ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন। বস্তুত, জীবনযাত্রার মানের ধারণাটি আরো ব্যাপক, আরো সমৃদ্ধ। এই ধারণাটির মধ্যে আসে জনসাধারণের চেতনা এবং সাংস্কৃতিক মানের সুস্থির বিকাশ। প্রাত্যহিক জীবনের সাংস্কৃতিক আদর্শ, আচার-আচরণ, এবং আমি যাকে বলতে চাই যুক্তিসঙ্গত ভোগ—সেসব এর অন্তর্ভুক্ত। ·· নীতিগত এবং সৌন্দর্যগত বিচারে অবসর সময় যথাযথ ব্যবহারও এর মধ্যে পড়ে। এক কথায়, সেই সমস্ত-কিছুর সমাহার যা সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী সুসভ্য বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১২-১৩)

ততীয়ত, এবং সবশেষে, "নেপ"-পর্বে লেনিন যে-সমস্ত সতর্কবাণী এবং উপদেশ দিয়েছিলেন, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত সমাজের অগ্রণী অংশ শ্রমিকশ্রেণীকে সেই-সমস্ত কথা অনবরত মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। কেননা, "নেপ"-পর্বের সঙ্গে কিছু-কিছু বিষয়ে গোরবাচেভের সংস্কারের মিল আছে। সেটি হল এই প্রশ্ন: সমাজতান্ত্রিক আর মূলধনতান্ত্রিক উপাদানগুলির মধ্যে সংগ্রামে "কে জিতবে?" এবং "কে কাকে হারাবে?" কতকগুলি বাস্তব বাধ্যবাধকতার দরুন এই-যে সংস্কারগুলিতে হাত দিতে হয়েছে, সেগুলি অবশ্যই বিশেষভাবে সোভিয়েত অর্থনীতিতে এবং সমগ্রভাবে সোভিয়েত সমাজে মূলধনতান্ত্রিক উপাদানগুলির জন্ম দেবে এবং তাদের শক্তিবৃদ্ধি করবে। সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী অংশকে সতর্ক করে দিতে হবে এবং তাঁদের এভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে তাঁরা এই মূলধনতান্ত্রিক উপাদানগুলিকে আটকে রাখতে পারেন, এবং পরাস্ত করতে পারেন।

২

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিচার অনুযায়ী, নির্ধারক সমস্যাটি হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধন। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এবং সরকার এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেছেন। যেমন, গণতন্ত্রকে বিস্তৃত, গভীর এবং রক্ষা করার জন্য কতকগুলি নীতি। নিঃসন্দেহে, এগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। কিন্তু, যত গুরুত্বই এদের থাকুক, মোটের উপর, এগুলি রোগলক্ষণের চিকিৎসা ছাড়া আর বেশি কিছু নয়। এগুলির সঙ্গে, সোভিয়েত সমাজের বিপ্লবোত্তর বিবর্তন, তার বিশেষ দুর্বলতা আর ঘাটতি এবং তাদের ঐতিহাসিক উৎসের গভীরতর উপলব্ধি যদি যুক্ত না হয়, সোভিয়েত সমাজ এবং রাষ্ট্রবিন্যাসের মূল রোগটিকে সারানো যাবে না।

সোভিয়েত সমাজের মূল সমস্যা, এবং স্তালিনীয় বিকার-বিকৃতির রূপে তার যে বৃদ্ধি, তার মূল নিহিত নিম্নবর্ণিত দুটি ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারে:

(১) গত ছয় দশকে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত বিকাশের ফলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও, আপেক্ষিকভাবে উৎপাদিকা শক্তির স্তর নিম্ন হওয়ার দরুন, উন্নত সমাজতন্ত্রের যথোপযুক্ত ভিত্তি তৈরি হয়ে ওঠে নি।

(২) এমন একটি সুপরিণত, আত্মনির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণীর অভাব, যে শ্রেণী বাস্তব জীবনে বুর্জোয়া-শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত এবং সুদৃঢ় হয়ে উঠেছেন, এবং তারই ফলে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ এবং বিকাশে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করার শক্তি অর্জন করেছেন।

মার্কস উন্নত সমাজতন্ত্রকে বলেছেন, 'স্বাধীনতার জগৎ', ('দ্য রেল্‌ম্‌ অব ফ্রীডম্‌')। বাইরের আবশ্যক সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য [মানুষকে] একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই বাধ্য হয়ে শ্রম করতে হয়। এই [বাধ্যবাধকতার] সীমা অতিক্রম করার আগে এই স্বাধীনতার জগৎ শুরু হয় না। ·· সমাজীভূত [সোস্যালাইজড] মানুষ, তার সহযোগী উৎপাদকদের সঙ্গে একযোগে যখন প্রকৃতির সঙ্গে যুক্তিসংগতভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে, কোনো অন্ধ শক্তির দ্বারা শাসিত হওয়ার পরিবর্তে সেই সম্পর্ককে সামূহিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে নিয়ে আসে···তখন, শক্তির সর্বনিম্ন প্রয়োগে এবং মানব-স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশে তার লক্ষ্য অর্জন করে।' (কার্ল মার্কস, "ক্যাপিটাল", ৩য় খণ্ড, সরস্বতী প্রেস, কলকাতা, ১৯৪৬, পৃ ৬৫১-৫২)

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বলশেভিক বিপ্লবের এই একসপ্ততিতম বৎসরেও উৎপাদিকা শক্তির বর্তমান স্তর এত নীচু যে, আবশ্যক সামগ্রী আর "বিলাস"-সামগ্রী—দুইয়ের জন্যই দোকানের সামনে লম্বা কিউ দাঁড়িয়ে যায়। বস্তুত, বিকাশের মূলধনতান্ত্রিক স্তরের অসমাপ্ত কর্তব্যগুলিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের যথোচিত বাস্তব ভিত্তি সৃষ্টি করার জন্য, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব আজ সোভিয়েত দেশে মূলধনতান্ত্রিক প্রবণতাকে সীমিত সুযোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

এইসব কনসেশন দেওয়ার পিছনে যে অনিবার্য বাধ্যবাধকতা আছে, তার তাৎপর্য আমাদের খোলা-খুল বুঝে নিতে হবে। তাৎপর্যটি এই যে, পশ্চিম ইউরোপের উন্নত মূলধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব না হওয়া পর্যন্ত সোভিয়েত দেশে পূর্ণ-বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা সত্যই সম্ভব নয়। (সম্পাদের বৃহৎ একটি অংশ সামাজিক ভোগের পরিবর্তে প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় করতে হওয়া; সমাজতান্ত্রিক দেশের সাধারণ মানুষের উপর উন্নত মূলধনতান্ত্রিক দেশগুলির সন্তোগসর্বস্ব সংস্কৃতির প্রভাব—এই দুটি কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যথার্থ সুবিকশিত সমাজতান্ত্রিক স্তরে উত্তরণের জন্য

প্রয়োজনীয় বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে।)

অনতিক্রমণীয় বাধাগুলিকে স্বীকার করার পরিবর্তে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা এই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সোভিয়েত দেশ অনেক আগেই উন্নত সমাজতন্ত্রের স্তরে পৌঁছে গেছে। এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত একাধিক ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয়ত, একটি প্রাজ্ঞ, বিচারমনস্ক, সচেতন, আত্মনির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণী না-থাকা। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, বলশেভিক পার্টির অল্পসংখ্যক শ্রমিক-ক্যাডাররা গৃহযুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সময় বৈপ্লবিক সংগ্রামে প্রধানত ধ্বংস হয়ে যায়। একথাও ভালোমতো জানা আছে যে, প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ায় ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত যে শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল, দেশের বিপুল কৃষক-জনগণের তুলনায় তারা ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এবং সে সময়ে জ্বালানি আর কাঁচামালের অভাবে তীব্র আর্থ-নীতিক বিপর্যয়ে কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য তারা ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে লেনিনের কোনো মোহও ছিল না, এবং সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি কোনো লুকোচুরিও করেন নি। ১৯১৯ সালে তিনি লিখলেন, 'সোভিয়েতগুলি তাদের কর্মসূচি অনুসারে হল শ্রমিকদের দ্বারা প্রশাসনের সংস্থা, কিন্তু বাস্তবে সেগুলি হল—শ্রমিকদের দ্বারা নয়, শ্রমিকদের তরফে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় অংশের দ্বারা প্রশাসনের সংস্থা।' (লেনিন, সংকলিত রচনাবলী, মস্কো, ২৪শ খণ্ড, পৃ ১৪৫)

পরে, বলশেভিক পার্টির ১০ম নিখিল-রুশ সম্মেলনে তিনি আরও তীব্র ভাষায় বলেন, 'শ্রেণীচ্যুত (declassed) প্রোলেতারিয়েত' চুরি আর মুনাফা-বাজিতে লিপ্ত হচ্ছে। 'সোভিয়েত ক্ষমতার অস্তিত্বকে বিপন্ন করার পক্ষে এইটাই প্রধান বিপদ।' (সংকলিত রচনাবলী, ৩২শ খণ্ড, পৃ ৪১১-১২)

এর কিছু পরেই লেনিন বলেন, 'বর্তমানে পার্টির প্রলেতারীয় পলিসি তার সদস্যদের চারিত্রের দ্বারা নির্ধারিত হয় না—নির্ধারিত হয় একটি ছোটো গ্রুপের দ্বারা যাঁদের বলা যেতে পার্টির গুলড গার্ড; তাঁরা বিপুল, অখণ্ড সম্মান ভোগ করেন।' (সংকলিত রচনাবলী, ৩৩ খণ্ড, পৃ ২৫৭)

উপদলীয় কোঁদল আর স্তালিনের সন্ত্রাসবাদী কার্যধারার ফলে পার্টির গুলড গার্ড ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল; আর হট হাউসে গাছ গজানোর কায়দায় নতুন একটি শ্রমিকশ্রেণী তৈরি করা হয়েছিল, যারা দীর্ঘ দিন ধরে বিচারমনস্ক প্রলেতারীয় চেতনা অর্জন করতে পারে নি। আইজাক ডয়েটস্যার ঠিকই বলেছিলেন,

> ১৯৩০-এর কালসীমায় প্রায় কুড়ি লক্ষ কৃষককে শহরে নিয়ে আসা হয়েছিল। বেদনা আর বিহ্বলতার মধ্য দিয়ে তাদের শহর-জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়েছিল। বহু দিন ধরে তারা থেকে গিয়েছিল বাস্তুচ্যুত গ্রামের মানুষ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে শহরবাসী, মরিয়া, উচ্ছৃঙ্খল, অসহায়। কারখানায় কাজে তারা অভ্যস্ত ছিল না, কঠোর শৃঙ্খলায় তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হত। "আনফিনিশড রেভলিউশন", অকসফোর্ড পেপারব্যাক, ১৯৬২, পৃ ৪৭-৮)

মার্কস আর এঙ্গেলস তাঁদের তত্ত্বের একেবারে প্রারম্ভিক পর্যায়ের ব্যাখ্যানে বলেছিলেন—বিপ্লবী শ্রেণী বৈপ্লবিক শিক্ষা ছাড়া নতুন সমাজে শাসন করার ক্ষমতা অর্জন করে না।

১৯৩০-এর সেই আধা-ভূমিদাস শ্রমিকদের পৌত্র-প্রপৌত্ররা আজ নগর-জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে—সোভিয়েত সামাজিক জীবনে এখন তারা প্রধান সামাজিক শক্তি। ইতিমধ্যেই তারা ক্লাস-ইন-ইট-সেলফ অর্থাৎ সমস্বার্থবোধসম্পন্ন সামাজিক শ্রেণী হয়ে উঠেছে; কিন্তু নেতৃত্বের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেতন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাদের ক্লাস-ফর-ইটসেলফ অর্থাৎ সমাজপরিবর্তনের দায়িত্ব-প্রাপ্ত সচেতন শ্রেণী হয়ে উঠতে হবে। সোভিয়েত

কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্বের সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কারের যে কর্মসূচি, শ্রমিকশ্রেণী এই ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য উঠে এলেই তার বস্তুগত-সামাজিক ভিত তৈরি হবে। সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণীর বিষয়গত পরিপক্কতাই এই প্রক্রিয়ার সাফল্য নিয়ে আসবে।

এই অবস্থায়, পূর্বে-উল্লিখিত দুটি বাধা সত্ত্বেও রুশ বলশেভিকদের বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তিকে উৎখাত করে সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার ঐতিহাসিক উদ্যোগকে প্রবলভাবে সমর্থন করেও লেনিন তাঁর শেষ লেখা "বেটার ফিউয়ার বাট বেটার"-এ বলেছিলেন, 'কিন্তু আরো উন্নত দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে এগিয়ে চলা সহজ নয়।' (সংকলিত রচনাবলী, ৩৩শ খণ্ড, পৃ ৪৯৮)

তিনি আরও বলেন, '...বর্তমানে আমরা এই প্রশ্নের সম্মুখীন—পশ্চিম-ইউরোপীয় মূলধনতান্ত্রিক দেশগুলি সমাজতন্ত্রে তাদের বিকাশ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত, আমাদের ক্ষুদ্র এবং অতিক্ষুদ্র কৃষক-অর্থনীতি নিয়ে, আমাদের এই ধ্বংসের অবস্থায়, আমরা [এই বিজয়] ধরে রাখতে পারব কি?' (সংকলিত রচনাবলী, ৩৩শ খণ্ড, পৃ ৪৯৯)

লেনিন বলেছিলেন, 'সরাসরি সমাজতন্ত্রে পৌঁছে যাওয়ার রাজনৈতিক উপাদান আমাদের থাকলেও, আমাদের যথেষ্ট সভ্যতা [সিভিলাইজেশন]-র অভাব আছে।' (স. র., ৩৩শ খণ্ড, পৃ ৫০১)

এই অবস্থায়, কৃষকসমাজের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সহযোগিতা নিয়ে, এবং শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক মান ক্রমে-ক্রমে উন্নত করে, ধীরে-ধীরে সতর্কভাবে সমাজ-তান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে এগোনোর উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করব যেখানে শ্রমিকরা কৃষক-দের উপর নেতৃত্ব বজায় রাখবে, যেখানে শ্রমিকদের উপর কৃষকদের আস্থা বজায় থাকবে, এবং সর্বাধিক মিতব্যয়িতা অনুসরণ করে আমাদের সামাজিক সম্পর্ক থেকে ব্যয়বাহুল্যের সমস্ত চিহ্ন দূর করা হবে।'

এমন-কী ১৯২৪ সালের এপ্রিলেও স্তালিন 'এক-দেশে সমাজতন্ত্র'র সঙ্গে পূর্ণবিকশিত বা সম্পূর্ণ সমাজ-তন্ত্রকে এক করে দেখেন নি। তিনি ৩০ এপ্রিল, ১৯২৪-এ বলেন, 'একদেশে প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতাকে উৎখাত করার অর্থ এই নয় যে, সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিজয় হয়েছে। সমাজতন্ত্রের যেটি প্রধান কাজ—সামাজিক উৎপাদনের সংগঠন—সে কাজ এখনও করা হয় নি। কয়েকটি অগ্রসর দেশের প্রলেতারিয়ানদের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া একদেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় কি সম্ভব? না, তা সম্ভব নয়।' (সূত্র: ই. এইচ. কার, "দি ইন-টেরেগনাম", ১৯২৩-২৪, পেলিক্যান, ১৯৬৯, পৃ ৩৬৪। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দ্র. স্তালিনের সংকলিত রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ১১০-১১)

বাস্তবিক, ই. এইচ কার যেমন বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন, রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে আন্তঃ-পার্টি বিতর্কের প্রথম পর্বে, 'একদেশে সমাজতন্ত্র'র প্রবক্তা আর তাঁদের বিরোধীদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল না। তিনি বলছেন:

> তত্ত্বগতভাবে, দুই মতের পার্থক্য যুক্তির চাপে প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়ার মতো হয়েছিল। একদেশে সমাজ-তন্ত্রর সমর্থকরা এই পর্বে এমন দাবি করেন নি যে একটি পিছিয়ে-থাকা দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ সফল হতে পারে; তাঁরা নির্মাণ-প্রক্রিয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন। বিরোধীরা একথা অস্বীকার করেন নি যে কিছুটা অগ্রগতি সম্ভব; তবে তাঁরা এই কথার উপর জোর দিয়েছিলেন যে কাজটি কাজটি হবে অসম্পূর্ণ, এবং তাকে সম্পূর্ণ করা হবে অসম্ভব। (ই. এইচ. কার, "সোস্যালিজম ইন ওয়ান কানট্রি", ১৯২৪-২৬, ২য় খণ্ড, পেঙ্গুইন, ১৯৭০, পৃ ৬০)

বলশেভিক পার্টির পলিট-ব্যুরোর নেতৃস্থানীয় সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই যত তীব্র হতে লাগল, স্তালিনবিরোধীদের মত উত্তরোত্তর এই বলে নিন্দিত

হতে থাকল যে, বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর বৈপ্লবিক ঘাঁটিকে শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে বিপ্লবকে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে, আর স্তালিনের নিজের মত ক্রমে-ক্রমে এই অবস্থানে এসে দাঁড়াল যে, স্থিরপদে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। ১৯৩৬-এর নভেমবরে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের 'খসড়া সংবিধান'-এর রিপোর্টে স্তালিন দাবি করলেন যে, 'আমাদের সোভিয়েত সমাজ ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মূলত সফল হয়েছে : এই সমাজ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলেছে, অর্থাৎ, মার্কসবাদীরা যাকে বলে থাকেন কমিউনিজমের প্রথম, বা নিম্নতর, পর্যায়—সেই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। অতএব, মূলত, আমরা কমিউনিজমের প্রথম পর্যায় অর্জন করেছি ··সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে।' ("লেনিনবাদের সমস্যা", মস্কো, ১৯৪৭, পৃ ৫৪৮)

এন. এস. ক্রুশ্চভ স্তালিনের 'ব্যক্তিপূজা' এবং তাঁর কিছু তাত্ত্বিক মতের সমালোচনা করলেও, তিনিও কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে চলার ভবিষ্যদৃষ্টি আঁকড়ে থাকলেন। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশ কংগ্রেসে রিপোর্টে তিনি বললেন :

> বিংশ কংগ্রেসের পর থেকে আমাদের পার্টির কাজকর্মের প্রধান ধারাটি ছিল পূর্ণাঙ্গ কমিউনিস্ট নির্মাণ-পর্বের মৌলিক কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়াস চালানো। ·· আমরা ক্রমশই আমাদের মহৎ লক্ষ্যের নিকটবর্তী হচ্ছি, এবং এখন স্পষ্টভাবে সেই উজ্জ্বল চূড়াটি দেখতে পাচ্ছি যেখানে সোভিয়েত জনসাধারণ নিকট ভবিষ্যতে কমিউনিজমের পতাকা উড়িয়ে দেবে। (তুমুল হর্ষধ্বনি) ["রোড টু কমিউনিজম", মস্কো, ১৯৬১, পৃ ৫৮]

একথা মনে রাখা দরকার যে, সমাজতন্ত্রের বিকাশ এবং কমিউনিজমের অভিমুখে অগ্রগতি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলা হচ্ছিল বৈষয়িক ক্ষেত্রে কতকগুলি উন্নতির ভিত্তিতে—যেগুলি পরে অতিরঞ্জিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর অন্য দিকটি—নৈতিক দিকটি—প্রধানত উপেক্ষিত হয়েছে। মার্কস গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, প্রলেতারিয়েতের 'তার রুটির চেয়েও বেশি প্রয়োজন সাহস, আত্মবিশ্বাস আর স্বাধীনতার বোধ।' (মার্কস-এঙ্গেলস সংকলিত রচনাবলী, মস্কো ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ২৩১)

মার্কস কমিউনিজম বলতে কল্পনা করেছিলেন, 'মানুষের সামাজিক (অর্থাৎ মানবিক) জীব হিসাবে আবার সম্পূর্ণভাবে নিজের কাছে প্রত্যাবর্তন—পূর্ববর্তী বিকাশের সমগ্র ঐশ্বর্যকে নিয়ে সচেতন প্রত্যাবর্তন।' ("ইকনমিক অ্যানড ফিলসফিক্যাল মানুসক্রিপটস", মস্কো, পৃ ১০২)

একথা আজ আর অজানা নয় যে স্তালিনের আমলে সোভিয়েত দেশের শ্রমিক আত্মবিশ্বাস আর স্বাধীনতার বোধ অর্জন, এবং বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে নিজের কাছে সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন তো করেনই নি, বরং তাঁরা প্রধানত রাষ্ট্রের আর পার্টির আমলাতন্ত্রের হাতে ব্যবস্থাপনার বস্তু হয়ে থেকেছেন। ক্রুশ্চভ বড়ো জোর এই অবস্থার কিছু প্রান্তিক সংশোধনের চেষ্টা করছিলেন। তাই, পূর্ণাঙ্গ কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা একেবারেই গ্রাহ্য হওয়ার মতো ছিল না।

বহু তাত্ত্বিক-রাজনৈতিক ভ্রান্তি এবং নানা অপরাধ ছাড়াও, প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ সম্বন্ধে স্তালিনের সমগ্র ধারণাটি ছিল উপর-মহল থেকে সামাজিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আচ্ছন্ন। যেমন, ১৯২০ সালে তিনি বলেছিলেন, 'তিন বছর আগে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের অঙ্গুলিমেয় কয়েক জন বলশেভিক সদস্য মিলিত হয়ে কেরেনস্কির প্রাসাদ ঘেরাও করার, তাঁর হতোদ্যম সেনাবাহিনীকে বন্দী করার এবং সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।' ("সংকলিত রচনাবলী", ৪র্থ খণ্ড, মস্কো, পৃ. ৩৯৬)

এই বক্তৃতারই কিছু পরে তিনি আবার বলেন, 'আমরা, এই ছোটো দল, বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিদের ক্ষমতাচ্যুত করি এবং ক্ষমতা দ্বিতীয় কংগ্রেসে ফিরিয়ে দিই।' ("সংকলিত রচনাবলী",

৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৪)

স্তালিনের ওই দুটি উদ্‌ধৃতির সঙ্গে, ওই একই বিষয়ে লেনিনের উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যান যদি তুলনা করে দেখা যায়, তাহলে বোঝা যাবে—যথার্থ মার্কসবাদী উপলব্ধি থেকে স্তালিন কিভাবে সরে গিয়েছিলেন। ১৯১৭-র ফেবরুয়ারিতে লেনিন বলেছিলেন, 'রুশ প্রলেতারিয়েত, কৃষকসমাজের একাংশের সঙ্গে ···এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গেও যুক্ত হয়ে রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে। ১৯১৭-র ২১শে এপ্রিল প্রলেতারিয়েত সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর একচ্ছত্র শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে, বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে আপোসে ইচ্ছুক পেটি-বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে। তরা জুলাই শহরের প্রলেতারিয়েত স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে আপোসপন্থীদের সরকারকে এক প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। ২৫শে অকটোবর তারা ওই সরকারকে উচ্ছেদ করে প্রলেতারিয়েত এবং গরিব কৃষকদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।' ("সংকলিত রচনাবলী", ২৭শ খণ্ড, পৃ. ৬২)

সোভিয়েত সমাজে গণতন্ত্র এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কাজে সত্য-সত্যই এগোতে হলে, স্তালিনের তথাকথিত ব্যক্তিপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত প্রচণ্ড বিকার-বিকৃতির সংশোধন করলেই হবে না; স্তালিনের সময়ে এবং স্তালিনের পরবর্তী কালে সামাজিক-রাজনৈতিক বিবর্তনের সমগ্র প্রক্রিয়াটির গভীর পুনর্বিবেচনা করতে হবে—যাতে সোভিয়েত জীবনে এখনো বিদ্যমান ওই প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করা যায়।

এই কাজে হাত না দিয়ে, গোরবাচেভ এখনও স্তালিনের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে অযৌক্তিক গৌরবায়ন করে চলেছেন।

মার্কস যখন তাঁর প্রগতিশীল বৌদ্ধিক জীবন শুরু করেন, তখন তিনি 'যে-সমস্ত সম্পর্ক মানুষকে হৃতমান, শৃঙ্খলিত, পরিত্যক্ত, ঘৃণাস্পদ জীব করে তোলে, সেই-সমস্ত সম্পর্কের উচ্ছেদের নিঃশর্ত নৈতিক আবশ্যকতা স্বীকার করেন। স্তালিন সমগ্র সোভিয়েত জনসমাজকে কেবল যে সন্ত্রাসতাড়িত বন্দীতে পরিণত করেন তাই নয়, তিনি সারা দেশ জুড়ে আক্ষরিক অর্থেই অসংখ্য 'গুলাগ আরকিপেলেগো' তৈরি করেন যেখানে সৎ বিপ্লবীদের প্রতি প্রাচীন কালের ক্রীতদাসদের চেয়েও নির্মম আচরণ করা হয়েছিল।

স্তালিনের কুখ্যাত নীতি এবং আচরণের বিশদ সমালোচনার স্থান এটি নয়, তার উপযুক্ত অবকাশও এখানে নেই। কিন্তু পেরেসত্রোইকা আর গ্লাসনস্তকে যদি সার্থক করে তুলতে হয়, তাহলে স্তালিন-প্রশ্নে গোরবাচেভ নেতৃত্বের দ্বিধা, দ্বিচারিতা আর পল্লবগ্রাহিতা স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে—যাতে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি সত্য-সত্যই নতুন সভ্যতার পথ প্রশস্ত করে। পরের পরিচ্ছেদে সেই বিষয়ে আলোচনার সীমাবদ্ধ প্রয়াস।

৩

প্রথম কথা, স্তালিনের ঐতিহাসিক ভূমিকার নেতিবাচক দিকগুলি সম্বন্ধে গোরবাচেভের সমালোচনা অত্যন্ত মৃদু। তিনি অভিযোগ করেছেন, স্তালিন 'পার্টি এবং সরকারের নেতৃত্বে একটি প্রশাসনিক-হুকুমশাহির ব্যবস্থা' প্রবর্তন করেন। কিন্তু আসলে যা উঠে আসে তা হল এক ব্যক্তির সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্র। তিনি 'কৃষকসমাজের প্রতি লেনিনের নীতি থেকে সরে আসা'র কথা বলেছেন; স্তালিন কিন্তু এই ক্ষেত্রে আসলে লেনিনের নীতি উলটে দিয়েছেন, তাঁর নির্দেশকে লঙ্ঘন করেছেন। তার ফলে কৃষকসমাজের অগণিত মানুষ আর তাদের খামারের পশু নিহত হয়েছে।

স্তালিনের অপরাধগুলিকে গোরবাচেভ কিভাবে বিচার করেছেন তা বোঝা যায় এই বিবৃতি থেকে :

তাঁর আমলে 'পার্টির ভিতরে আর বাইরে হাজার-হাজার মানুষ সার্বিকভাবে নির্যাতন ভোগ করেছেন।' আসল ঘটনা এই, নির্যাতনের সংখ্যা হাজার-হাজার নয়, লক্ষ-লক্ষ।

আরও গুরুত্ববহ কথা হল—স্তালিনের ভূমিকা এবং নেতৃত্বের সামগ্রিক চারিত্র সম্বন্ধে গোরবাচেভের বিচার অতিমাত্রায় সদর্থক। তিনি বলছেন : 'সংক্ষেপে, স্তালিনের পরিচালনায় পার্টির নেতৃত্বদায়ী মূলগোষ্ঠী মতাদর্শগত সংগ্রামে লেনিনবাদকে রক্ষা করেছে।'

পূর্বে আমরা যে আলোচনা করেছি, তাতে এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, স্তালিন যদি সত্যিই লেনিনবাদকে রক্ষা করে থাকেন, তবে তা করেছেন তার প্রকৃত মর্মবস্তুকে ধ্বংস করার জন্য! যে মার্কসবাদীরা 'একদেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজে স্তালিনের ঐতিহাসিক কৃতিত্বে'র প্রশংসা করে থাকেন, তাঁরা সমাজবিবর্তনের ধারাকে নির্বিকল্প এবং অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিতে বিচারের অপরাধে অপরাধী—সেই বিচারে প্রকৃত জীবনের বাস্তব বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে উপেক্ষিত। সোভিয়েত দেশে শ্রমিকশ্রেণীর শাসনের প্রথম দুর্গটিকে রক্ষা করার নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে স্তালিন এই কাজটি করতে এগিয়েছিলেন, তাতে মার্কসবাদের একান্ত মর্মবস্তুটিই লঙ্ঘিত হয়েছিল, এবং রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার যে পথনির্দেশ লেনিন দিয়েছিলেন, তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

স্তালিনের এই-সমস্ত সমালোচনার অর্থ এই নয় যে, ট্রটস্কিকে, অথবা লেনিনের সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা তাঁর পরেও বেঁচে ছিলেন তাঁদের কাউকে, পরোক্ষভাবে সমর্থন করা হচ্ছে। এই প্রশ্নে লুকাচের সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে একমত হওয়া যায় :

'এ কথা না বললেও চলে যে, তিরিশের যুগে আর তার পরে যাঁরা স্তালিনের দ্বারা অন্যায়ভাবে নিপীড়িত, ধিক্কৃত এবং নিহত হয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ (গুপ্তচরবৃত্তি, সাবোতাজ ইত্যাদি) থেকে তাঁদের অব্যাহতি দিতে হবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তিও···'পুনর্বাসনে'র বিষয় হবে।' তিনি আরও বলেন, 'স্তালিন-আমলকে আমরা স্বৈরাচারী এবং অগণতান্ত্রিক বলি, ট্রটস্কির মৌলিক ভাবনার সঙ্গে তার একটা নিকট নীতিগত সম্পর্ক আছে। ট্রটস্কির অধীনে কোনো সমাজতান্ত্রিক সমাজ, অন্তত স্তালিনের অধীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের মতোই, অগণতান্ত্রিক হত।' (জর্জি লুকাস, "রিফ্লেকশনস অন দ্য কাল্ট অব স্তালিন", "সারভে—এ জারনাল অব সোভিয়েত অ্যানড ঈস্ট ইউরোপীয়ান স্টাডিজ", সংখ্যা ৪৭, এপ্রিল ১৯৬৩, পৃ ৬০-১)

বাস্তবিক, উত্তর-লেনিন রাশিয়ার সমস্ত বিকাশ-প্রক্রিয়া এই অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, বলশেভিক পার্টিতে এমন একজন নেতাও ছিলেন না, সমাজতন্ত্রের অভিমুখে কঠিন যাত্রাপথে পার্টির কর্মীরা যাঁর পাশে সমবেত হতে পারেন। চার্লস বেটেলহাইম যথার্থই বলেছেন, ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ থেকে জুন ১৯১৮—এই নির্ধারক কালসীমায় কেন্দ্রীয় কমিটিতে এমন একদল নেতার আবির্ভাব ঘটল না 'যাঁরা দৃঢ়ভাবে এবং পূর্বপর-সমভাবে লেনিনের সঙ্গে সহমত—অন্তত তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ অন্যদের তুলনায় অনেক সহজে বা অনেক তাড়াতাড়ি লেনিনের পাশে এসে দাঁড়ালেন না। লেনিনের মৃত্যুর পর কী ঘটবে সেটা বুঝতে এই ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ।' (চার্লস বেটেলহাইম, "ক্লাস স্ট্রাগলস ইন দি ইউ. এস. এস. আর—ফার্স্ট পীরিয়ড", ১৯১৭-১৯২৩, দ্য হারভেস্টার প্রেস, ১৯৭৬, পৃ ৩৭৮)

এখানে যে বিষয়টি বলবার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটি এই যে, পেরেসত্রোইকা যদি তার ঘোষিত লক্ষ্য পুনর্বিন্যাস অর্জন করতে চায়, তাহলে গ্লাসনস্তকে তার যুক্তিসঙ্গত সীমা পর্যন্ত অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ, গোরবাচেভ তাঁর ১৯৮৬-র খাবারোভ্স্ক্ বক্তৃতায় যে 'সামাজিক বিপ্লব'-কে আকাঙ্ক্ষা করেছেন, তাকে

যদি সত্যই সার্থক করে তুলতে হয়, তাহলে কোনো মানসিক প্রতিবন্ধ ছাড়াই স্তালিন-প্রশ্নকে বিচার করতে হবে। এই কাজটি গোরবাচেভ নেতৃত্ব এখনো করেন নি।

কথাটি হল, ভবিষ্যৎকে রূপ দিতে হলে অতীতকে সমালোচনা আর আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে।

সমস্ত সাক্ষ্য থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, সোভিয়েত দেশে পুনরুজ্জীবনের বিষয়গত এবং বিষয়িগত দু ধরনের শক্তিই একে অন্যের উপর ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া করছে। সেই শক্তি দুটি হল, একদিকে, একটি বিশাল, নগরায়িত, শিক্ষিত (লেনিনের ভাষায়, সভ্য) এবং উত্তরোত্তর আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী শ্রমিকশ্রেণী; অন্যদিকে বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত সমাজের বিবর্তন সম্বন্ধে প্রচণ্ড পরিমাণে বিচারশীল মূল্যায়ন। পেরেসত্রোইকার আসল কাজ হল, সোভিয়েত সমাজের অভ্যন্তরে যে ইচ্ছা-আবেগ জন্ম নিচ্ছে, তাকে ভাষা দেওয়া, পরিচালনা করা। গোরবাচেভ আর তাঁর কমরেডরা এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ পর্যন্ত তাঁরা যা করেছেন, তার চেয়েও আরো অনেক বেশি তাঁদের করতে হবে।

8

পেরেসত্রোইকার দীর্ঘমেয়াদি পরিপ্রেক্ষিত বিশদ করে বলতে গিয়ে, আন্তর্জাতিক পরিসরে এই নীতির নতুন গতির অভিমুখ আর ধ্রুবক (প্যারামিটার) নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গোরবাচেভ কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এগুলিকে বিশ্লেষক দৃষ্টিতে দেখা প্রয়োজন। যেসব প্রশ্ন তিনি তুলেছেন, সেসব নিম্নলিখিত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত :

(১) সাম্রাজ্যবাদের চারিত্রের পুনর্বিবেচনা; (২) আজকের দিনে মূলধনতন্ত্র এবং সমরবাদের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক; (৩) মূলধনতন্ত্র এবং নয়া-উপনিবেশবাদের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক; (৪) মূলধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক জগতের বৌদ্ধিক এবং নৈতিক মূল্যমানের সহ-অবস্থানের সম্ভাবনা। ("অকটোবর অ্যানড পেরেসত্রোইকা", পৃ ৬২-৫)

গোরবাচেভের নীতিনির্দেশ এবং ইঙ্গিত অনুসরণ করে সোভিয়েত বিদ্বজ্জন এবং তাত্ত্বিকরা বহু ধারণা আর অবস্থান উদ্ভাবন করছেন। সেসবের কিছু-কিছু বর্তমান লেখকের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। যেমন, তথাকথিত 'নতুন চিন্তা'র একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনের রিপোর্টে বলা হয়েছে :

> নতুন চিন্তার প্রয়োগের সীমা এবং তার ক্ষেত্র সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ-কিছু মতভেদ আছে। এঁদের কেউ-কেউ মনে করেন, শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব, এবং সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য প্রগতির বাস্তবোচিত এবং আপোসমূলক পথ নির্বাচন পর্যন্ত এই চিন্তাকে প্রসারিত করতে হবে। অপর পক্ষে, অন্যেরা মনে করেন, নতুন চিন্তা কেবল যুদ্ধ আর শান্তির সমস্যার সঙ্গেই সম্পর্কিত হবে, অন্য ক্ষেত্রে এর প্রসারণ অনুমোদন করা যায় না; নিউক্লীয় বিপদের আশঙ্কায় আমরা কখনোই বিমূঢ় হয়ে থাকব না·····
>
> (আর-একজন পণ্ডিত বলেন)···একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণীসম্পর্ক আর রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক—এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে আসছে, কারণ আজ যে-কোনো স্থানীয় সংঘাত আঞ্চলিক, এমন-কী সর্বজাগতিক যুদ্ধে পরিণত হতে পারে। নিউক্লীয় যুগে সংগ্রামের রূপ নির্বাচনে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, এবং বৈপ্লবিক শক্তিগুলির সভ্য, আপোসমূলক সংগ্রামের রূপ উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ করা উচিত। (এল. মিত্রোখিন, "নিউ থিঙ্কিঙ অ্যানড সোস্যাল প্রোগ্রেস", "সোভিয়েত রিভিউ", নতুন দিল্লি, সংখ্যা ৭, ১৯৮৮, পৃ ৩০)

শেষে বর্ণিত মতের প্রবক্তারা অবশ্য বলেন, 'এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, মার্কসবাদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য থেকে সরে আসা হচ্ছে : এর প্রবক্তারা নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, সংগ্রামের রূপ বাস্তব

অবস্থার উপর নির্ভরশীল—যার আজ নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে।' (একই সূত্র)

দেখা যাচ্ছে, এই 'নতুন চিন্তা'র প্রবক্তারা অবশ্যই বিচারের বহু নতুন উপাদান আর মানদণ্ড নিয়ে এসেছেন যা নিঃসন্দেহে মার্কসবাদের ক্ষেত্রে নতুন! আর, বড়ো কথা এই, এঁরা কেউই অজ্ঞাতকুল বুদ্ধিজীবী নন। এঁরা যে গোরবাচেভের মতেরই প্রতিধ্বনি তুলছেন, তা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত উনবিংশ সারা-ইউনিয়ন সম্মেলনে গোরবাচেভের বক্তৃতার এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাবে :

> এখনই বিদ্যমান বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ এই অনুমানকে যুক্তিদান করে যে, এই বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে শক্তিসংরক্ষণ আর নির্মাণ যদি সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে এই শতাব্দীর শেষে পৃথিবী নিম্নলিখিত প্রবণতাগুলির দ্বারা রূপগ্রহণ করবে :
>
> —স্বার্থান্ধ উচ্চাশা আর অন্ধ সংস্কারের পরিবর্তে যুক্তি, জ্ঞান এবং নৈতিক মূল্যমানের প্রভাবে ক্রমে-ক্রমে নিরস্ত্রীকরণ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মানবিকীকরণ ;……
>
> —প্রধানত জাতিসংঘের ভূমিকার উদ্‌বর্তনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার এক সর্বজনীন ব্যবস্থা রূপগ্রহণ করবে ;
>
> —সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক এবং প্রাযুক্তিক সুপ্তশক্তির বিপুল বিকাশ আরও সভ্য পদ্ধতিতে জাগতিক সমস্যার যুক্তভাবে সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হবে ;……

এর পর গোরবাচেভ বলছেন : 'এখানে কি কোনো ভ্রান্ত মোহ আছে? আগ্রাসন আর যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী উৎস কি উবে গেছে? না। সাম্রাজ্যবাদী সমরবাদের পক্ষ থেকে শান্তিভঙ্গের কথা আমরা ভুলে যাই নি। আমরা মনে করি—যে ইতিবাচক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাকে উলটে না-দেওয়ার মতো নিশ্চয়তা এখনো তৈরি হয় নি। বস্তুত, নতুন রাজনৈতিক চিন্তা আমাদের অতীতের তুলনায় আরো ব্যাপক রাজনৈতিক পরিসরে শক্তিপ্রয়োগের নীতিকে প্রতিরোধ করার নতুন সুযোগগুলিকে খুঁজে দেখতে সাহায্য করে। আমাদের শতাব্দীর শেষার্ধে এমন কিছু বাস্তব উপাদানের সৃষ্টি হয়েছে যাতে এইসব সুযোগ শক্তিলাভ করেছে।' ("ডকুমেন্ট্‌স্ অ্যানড মেটিরিয়ালস", পৃ ৩৫-৬)

নতুন সুযোগের প্রসঙ্গে কেউ অবশ্য গোরবাচেভ-এর সঙ্গে বিবাদ করবেন না। নিকট অতীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং শান্তির জন্য ব্যাপক সংগ্রামে সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণে এই নতুন সুযোগকে উপেক্ষা করার একটা ঝোঁক ছিল, যেজন্য সারা পৃথিবীতে বহুসংখ্যক স্বাধীন মার্কসবাদী আর শান্তিকর্মী সমালোচনা করেছিলেন। গোরবাচেভের আত্মসমীক্ষামূলক পর্যালোচনা এই সমালোচনার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করছে। কিন্তু গোরবাচেভ যখন বলেন,

> শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ এবং সমগ্র মানবসমাজের স্বার্থের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি একেবারে গোড়া থেকেই মার্কসবাদের অঙ্গীভূত হয়ে আছে। আমরা এ ব্যাপারে গভীরতর উপলব্ধিতে পৌছতে চেষ্টা করেছি। এ উপলব্ধি আমাদের এই সিদ্ধান্তে নিয়ে এসেছে যে আমাদের এই যুগে সাধারণ মানবিক মূল্যমানই অগ্রাধিকার পারে। নতুন রাজনৈতিক চিন্তার এই-ই হল সারবস্তু।
>
> নতুন রাজনৈতিক চিন্তা আমাদের আরো গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন জাতি যেসব নৈতিক মূল্যমান গড়ে তুলেছে, এবং মহৎ মনস্বীরা যা উচ্চারণ করে গেছেন, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেসব কী প্রবল গুরুত্ব বহন করে। (একই সূত্র, পৃ ৩২)

তখন তিনি আজকের এবং ভবিষ্যতের বিশ্ব-পরিস্থিতির বাস্তবোচিত পর্যালোচনা আর মৌলিক মার্কসীয় নীতিসমূহ—দুয়েরই সীমা অতিক্রম করে অনেক দূর চলে যান।

গোরবাচেভ আর তাঁর সমভাবুকরা যেভাবে সর্বমানবের স্বার্থ আর শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করাচ্ছেন, সেটা নিতান্তই অধ্যাত্মবাদী বিমূর্তনের প্রয়াস। কারণ, দুয়ের মধ্যে প্রকৃত কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" বলছে, 'প্রলেতারীয় আন্দোলন বিশাল গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের স্বার্থে বিশাল গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের আত্মসচেতন, স্বাধীন আন্দোলন' ছাড়া আর-কিছু নয়। (মার্কস-এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, দু-খণ্ড সংস্করণের ১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫০, পৃ ৪২)

এই আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বর্তমান বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে মানবসমাজের মুক্তিসাধন, যাতে 'প্রাকৃতিক শক্তির উপরে—তথাকথিত প্রকৃতি এবং মানুষের নিজস্ব প্রকৃতি—দুয়েরই উপরে, মানুষের কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়।'

এই যখন প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামের মৌলিক গতিমুখ, তখন প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির স্বার্থের কোনো সংঘাত থাকতে পারে না।

বিভিন্ন জাতির দ্বারা বহু শতাব্দী ধরে বিবর্তিত যে নৈতিক মূল্যমানের কথা গোরবাচেভ বলেছেন, তাও ভাববাদী চিন্তার প্রয়াস, বাস্তবের দ্বারা তা সমর্থিত নয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, স্বাধীনতার জন্য মানুষের যে প্রয়াস, তার ফলে হাজার হাজার বছর ধরে মানবিক মূল্যমানের কতকগুলি সাধারণ নীতি বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলি সীমিত, এবং শ্রেণীভেদের দরুন ব্যর্থ।

এ কথা সত্য যে, জাতিসংঘের আবির্ভাব আর তার দ্বারা কতকগুলি নীতির স্বীকৃতি প্রগতির পরিচয়চিহ্ন। কিন্তু সেগুলিকে কার্যকর করার মতো যথেষ্ট শক্তি না থাকায়, জাতিসংঘের জাতিগত এবং বর্ণগত সমতা, আর মানবিক অধিকারের নীতিগুলি মূলত এখনো সদিচ্ছার ঘোষণা হয়েই আছে।

সোভিয়েত বৈদেশিক নীতি যে পরিমাণে মূলধনতান্ত্রিক দেশগুলির অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামের ভূমিকাকে ছোটো করে দেখবে, সেই পরিমাণে তাকে কার্যকর করে তোলার শক্তি দুর্বল হবে।

এ ছাড়া, উন্নত আর উন্নতিশীল দেশগুলির অর্থনীতি এবং রাজনীতির উপর দু-শ ট্রান্সন্যাশনাল করপোরেশনের প্রচণ্ড ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অবদান, এবং সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির উৎপাদিকা শক্তির প্রভূত বিকাশকে যুক্তিসংগতভাবে বণ্টনের জন্য একটি নতুন আর্থনীতিক ব্যবস্থার সমস্ত পরিকল্পনা অলস স্বপ্ন হয়ে থাকবে।

মূলত, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সোভিয়েত নেতৃত্বের নতুন চিন্তার ভিত্তি—আজকের মূলধনতন্ত্রের আর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক শক্তির বিচারে অতিরঞ্জন, অর্থাৎ, মূলধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটের গভীরতাকে ছোটো করে দেখা। সংক্ষেপে বললে, মূলধনতন্ত্র আজ সংকটের এমন গভীরতায় নিমজ্জিত যেখানে

(১) উৎপাদক সম্পদের এক বৃহদংশ অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন এবং মহাশূন্যাভিযান (যা তার সামরিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত) ইত্যাদি সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় খাতে নিয়োগ করেই মাত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে ;

(২) মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্‌স্ এবং রোবোটীকরণ কয়লা, ইস্পাতের মতো মূলশিল্পকে ক্রমশই বন্ধ করে দিচ্ছে—যার দরুন উন্নত দেশগুলিতে লক্ষ-লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের জীবনে নিয়ে আসছে বেকারির সম্ভাবনা ;

(৩) এর পরিণতিতে, ধনী আর অতিধনী দেশগুলিতে দারিদ্র্য প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলেছে ;

(৪) সবশেষে, বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে বাতাস, জল আর মাটির পারিবেশিক ভারসাম্যচ্যুতি আর দূষণ মানবসমাজ আর পশুজগতের সামনে নিয়ে আসছে সমূহ ধ্বংসের আশঙ্কা।

বেশ কয়েক দশক ধরে উন্নত দেশগুলির জন-

সমাজের বৃহৎ থেকে বৃহত্তর অংশ—তাঁদের মধ্যে আছেন বুদ্ধিজীবী, ধর্মসম্প্রদায়, উদারনৈতিক-মানবতাবাদী মানুষ—বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু মূলধনতন্ত্রের বিকল্প একটি সামাজিক-রাজনীতিক ব্যবস্থার সন্ধান করে ফিরছেন। সেই একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্প হল সমাজতন্ত্র। কিন্তু সমাজতন্ত্র দীর্ঘদিন স্তালিনীয় বিকার-বিকৃতির দ্বারা চিহ্নিত, আর তারই সমতুল বলে বিবেচিত হওয়ার দরুন, জনসমাজের এই অংশ তাঁদের সন্ধানে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এখন, সোভিয়েত ইউনিয়নে পেরেসত্রোইকা আর গ্লাসনস্তের অগ্রগতির ফলে, সারা দুনিয়ার এগিয়ে যাওয়ার পথের বাধা ক্রমশ সরে যাচ্ছে। এখন, যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে মানুষের মনে আস্থা উৎপাদনের মতো করে, সমাজ-তন্ত্রকে বিকল্প হিসাবে তুলে ধরা সম্ভব, এবং তা করা প্রয়োজনও।

এ কথার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, মরিয়া হয়ে এগিয়ে যেতে হবে, বা, আনাড়ির মতো সংঘর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এ কথার অর্থ এই যে, মূলধন-তান্ত্রিক দেশগুলির সামাজিক-রাজনীতিক পুনর্বিন্যাস, এবং মূলধনতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যেকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্ন দুটিকে শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন না করে—শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করে তুলতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে নিপুণ-ভাবে, নমনীয়ভাবে, যথাযথভাবে।

৫

সোভিয়েত ইউনিয়ন বহুদিন আগেই বিকশিত সমাজতন্ত্রের স্তরে পৌঁছে গেছে—সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির এই সিদ্ধান্তের কথা আগে উল্লেখ করেছি। বলেছি—এই সিদ্ধান্তে অনেকগুলি ভুল ইঙ্গিত আছে। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের আলোচনা করার চেষ্টা এখন করব।

এই সিদ্ধান্তের গভীর বিচারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মার্কসের মতে, সমাজতন্ত্রের বিকাশের পরিমাণ এবং স্তর নির্ধারণের মূল নিরিখ হল—"বাইরের প্রয়োজন" সংগ্রহ করার বাধ্যবাধকতা থেকে শ্রম কী পরিমাণ মুক্তি পেয়েছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, মানবিক সম্ভাবনার সামগ্রিক স্ফুরণের জন্য কতখানি স্ব-আয়ত্ত সময় পাওয়া যাচ্ছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির "বিকশিত সমাজতন্ত্র"র সিদ্ধান্ত, এবং তার থেকে উৎপন্ন কতকগুলি অসুসিদ্ধান্তের তাৎপর্যকে আমরা বিচার করে দেখতে চেষ্টা করব।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মতে, সোভিয়েত সমাজ বিকশিত সমাজতন্ত্রের স্তরে পৌঁছে যাওয়ার ফলে, বৈর শ্রেণীসম্পর্ক অপসারিত হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে প্রলেতারীয় একাধিপত্যের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র এখন 'জনগণের রাষ্ট্র' এবং 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র'। পার্টির 'জনগণের রাষ্ট্র'-র ধারণা, একদিকে জনসাধারণকে 'আত্ম-নিয়মন এবং আত্ম-শাসন'-এর মধ্যে টেনে আনার প্রয়োজন, অন্যদিকে আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকে নির্মমভাবে খর্ব করে আনার প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই চিন্তাসর্বাংশে সঠিক এবং অনুমোদনীয়।

কিন্তু, 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র'-র অন্য ধারণাটির কয়েকটি বিপজ্জনক তাৎপর্য আছে। গোরবাচেভ বলছেন,

> সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্ম হয় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের হাতিয়ার হিসাবে, এবং সমাজবিকাশের পরবর্তী এক স্তরে, তা সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে বিবর্তিত হয়…
> সমস্ত শ্রেণী আর সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থ এবং ইচ্ছাকে গণতান্ত্রিক রীতিতে চিহ্নিত এবং রূপায়িত করার নির্বিঘ্নে-গতিশীল যন্ত্র হিসাবে, সেগুলিকে একটি সুশৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার এবং সোভিয়েত আভ্যন্তরিক আর বৈদেশিক নীতির কাঠামোর মধ্যে সেই স্বার্থ এবং ইচ্ছাগুলিকে সার্থক করে তোলার যন্ত্র হিসাবে। ("ডকুমেন্টস অ্যানড মেটিরিয়ালস",

পৃ ১৩০)।

বিশেষ-বিশেষ শ্রেণী আর সামাজিক স্বার্থকে ভাষা দেবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকাকে বাতিল করে দেবার মধ্যে বিপদ আছে—বিশেষ করে এখন যখন ব্যক্তিগত অর্জনের ব্যাপক সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে সামাজিক স্তরভেদ বৃদ্ধি পাবে। বৈজ্ঞানিক এবং প্রাযুক্তিক উন্নতির দ্রুতগতিও মানসিক আর কায়িক শ্রম, দক্ষ আর অদক্ষ শ্রমের মধ্যে ব্যবধানকে প্রশস্ত করে তুলবে।

অর্থনীতি আর প্রযুক্তির উন্নতির প্রয়োজনে এসব যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নেওয়া হলেও, এসবের সামাজিক রাজনৈতিক তাৎপর্যকে মনে রাখা প্রয়োজন।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এই সমস্যা সম্বন্ধে খুব স্পষ্টভাবে সচেতন নয় বলে মনে হয়। সেই কারণে, পার্টি নিজের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু, পার্টি শ্রেণীগতভাবে নিজের পরিচয় দিচ্ছে না—এটি একটি স্বাধীন সামাজিক শক্তি; মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে তার প্রজ্ঞা আর অন্তরদৃষ্টি আহরণ করে। এ উক্তির অর্থ কী, তা গোরবাচেভ বলেছেন :

> আমরা আজকের অবস্থায়, পার্টি সমাজের অগ্র বাহিনী—এই প্রত্যয়টিকে পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত করব। এই অগ্রবাহিনী, মার্কসবাদী লেনিনবাদী শিক্ষার দ্বারা চালিত হয়ে, দেশের বিকাশের সবচেয়ে গুরুতর বিষয়গুলির বিচার করে, পেরেসত্রোইকার মতাদর্শ সূত্রায়িত করে, এবং জনসাধারণের মধ্যে সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে তাঁদের অনুপ্রাণিত আর উৎসাহিত ক'রে, আমাদের বহুজাতিক সমাজকে অগ্রগতির সঠিক, সমাজতান্ত্রিক পথের নির্দেশ দেয়। ("ডকুমেন্টস্ অ্যানড মেটিরিয়ালস", পৃ ১২৭)

গোরবাচেভ এখানে অন্তত তিনটি ভুল করেছেন।

প্রথমত, তিনি প্রলেতারীয় একাধিপত্যের দুটি কর্তব্যের পার্থক্য নির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গ্রামসির ভাষায়, একটি হল, নেতৃত্বদায়ক (হেগিমনিসটিক), অন্যটি হল শাসনকারক (ডমিনেটিঙ)। এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে, পুরনো সমাজের শোষক শ্রেণীগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পর, অন্তত অর্ধশতাব্দী জুড়ে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসার এবং তার আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের পর, সোভিয়েত দেশে আর বৈর শ্রেণীবিরোধ নেই, অতএব, সেদেশে প্রলেতারীয় একাধিপত্যের শাসনকারক বা দমন-মূলক কাজের প্রয়োজন আর নেই। কিন্তু তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, সোভিয়েত জনসাধারণের সকল অংশের সামাজিক চেতনার স্তরে সমমনস্কতা এসে গেছে—অতএব, প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বদায়ক কাজের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, নেপ-ধরনের সুযোগের ফলে, ব্যাপক ক্ষেত্রে সামাজিক স্তরবিভেদ এবং তার ফলে, মূল-ধনতান্ত্রিক প্রবণতার বিকাশের সম্ভাবনা থাকায়, এবং, প্রযুক্তির উচ্চতর স্তরে যে অতিদক্ষ শ্রম এবং অর্থনীতির ভিত্তিমূলে যে প্রধানত কায়িক শ্রম—এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, পুরনো ধ্রুপদী অর্থে শিল্পশ্রমিকদের সচেতন সজাগ নেতৃত্বের, তাঁদের জীবনযাপন থেকে আহরিত সামূহিক চেতনার প্রয়োজন আজ অনেক বেশি করে জরুরি হয়ে পড়েছে।

তৃতীয়ত, এমন একটি কমিউনিস্ট পার্টির ধারণা, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যার কোনো আঙ্গিক বন্ধন নেই, সেই পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বাইবেল থেকে আহরিত জ্ঞানে প্রজ্ঞাবান—এই ধারণাটাই সম্পূর্ণভাবে অ-মার্কসবাদী। মিখাইল গোরবাচেভ 'সমাজের অগ্রবাহিনী হিসাবে লেনিনবাদী প্রত্যয়ের পার্টি'র কথা বলেছেন। কিন্তু লেনিন একান্তভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে 'শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী হিসাবে' আখ্যায়িত করেছেন (লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, ৪২শ খণ্ড, পৃ ৩৮২; ৩১শ খণ্ড, পৃ ২৪-৫, পৃ ১৮৭; ৩২শ খণ্ড, পৃ ৫০)। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য-বর্তিতা ছাড়াই কমিউনিস্ট পার্টি সমাজের অগ্র-বাহিনী—এই প্রত্যয়টি কেবল অবাস্তবই নয়, এর

মধ্যে স্তালিনীয় বিকার-বিকৃতির বীজ এবং স্বৈরাচারী বিচ্যুতির সম্ভাবনা থেকে যায়।

৬

সোভিয়েত দেশ এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নানা বিষয়ে সমালোচনা থাকলেও, সোভিয়েত রাষ্ট্র বা পার্টিকে হতমান করা যে লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য নয়, তা না বললেও চলে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐতিহাসিকভাবে যে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে, তাকে স্বীকার করতে লেখকের কোনো দ্বিধা নেই। এই দেশ অনেক প্রচণ্ড দুঃখ আর আত্মত্যাগের মূল্যে সর্বপ্রথম একটি সুস্থির, বিকাশশীল সমাজতা ব্লক সমাজ গড়ে তুলেছে; আবারো সোভিয়েত জনসাধারণের প্রচণ্ড দুঃখের মূল্যে নাৎসি-ফাসিস্ট ধ্বংস থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করেছে; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক-শৈল্পিক জোটের নিউক্লীয় একাধিপত্যকে ভেঙে পৃথিবীকে সাম্রাজ্যবাদী ভীতিপ্রদর্শন থেকে বাঁচিয়েছে। শুধু এই নয়—লেনিনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রথম দিকে তাঁর দ্বারা শিক্ষিত পার্টির পরিচালনায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, নীতি এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘাট ত সত্ত্বেও, আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রগতিমুখী করার কাজে একটি শক্তিমান উপাদান হিসাবে কাজ করেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শান্তি এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষা করেছে।

মুষ্টিমেয় কিন্তু প্রচণ্ডশক্তিধর ট্রান্সন্যাশনাল করপোরেশনগুলি তাদের বিশাল অস্ত্রসম্ভার এবং নিউক্লীয় শিল্পের বলে পৃথিবীকে সব সময়ে নিউক্লীয় মহাবিনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে। যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সামাজিক উৎপাদনের মৌলিক উপকরণগুলি সামাজিক সম্পত্তি, সেই সোভিয়েত ইউনিয়নই বর্তমান জাগতিক সমাজবিন্যাসকে উত্তীর্ণ করে একটি বিকল্প তুলে ধরেছে।

যে সমালোচনা করা হল, তার একমাত্র উদ্দেশ্য: সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক ভূমিকাকে শক্তিশালী করার জন্য যে কঠিন প্রয়াস চলেছে, সেই প্রয়াসে সামান্য একটু সহায়তা দেওয়া।

এই প্রবন্ধের শিরোনাম ভুল ছাপা হয়েছে। শুদ্ধরূপ:
"পেরেসত্রোইকা এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্নবায়নের সমস্যা"

বিষয়: ব্রহ্মদেশ

বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মদেশীয় সংগীত

(১০৫২-১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)

সংগীত মানুষের প্রাণের ভাষা। ভাবাবিষ্ট হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত উপহৃতি (গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় 'উপহৃতি' শব্দ দ্বারা ইংরেজি ইমোশন শব্দের অনুবাদ বুঝিয়াছেন) প্রকাশ করিতে সংগীতই প্রকৃষ্ট অবলম্বন। সুতরাং সকল দেশেই আদিম কাল হইতে সংগীতের অস্তিত্ব ছিল। ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের বেদগান যেমন আর্যাবর্তের প্রথম সংগীত, মিশর, পারস্য, মেক্সিকো এমন-কী বর্তমান ইওরোপীয় সংগীতের আদি জন্মভূমিতে তেমনি আদিম কাল হইতে তদনুরূপ সংগীতের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত বিধিতে সংগীতের চর্চা সকল দেশে, সকল সময়ে, সমানভাবে আরব্ধ ও আচরিত হয় নাই। সভ্যতার প্রগতি ও শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই সংগীতাদি কলাবিদ্যার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

অন্যান্য পুরাতন দেশের ন্যায় প্রাচীন ব্রহ্মদেশের আদিম অধিবাসী পিউলানের মধ্যেও (পিউদেশ ব্রহ্মদেশের পুরাতন নাম। পিউগণ ব্রহ্মদেশের আদিম নিবাসী ছিল) সংগীতের সমাদর ও চর্চা ছিল। কিন্তু প্রায় ৭০০ বৎসর হইল পিউজাতি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতীয়, মঙ্গোলীয় ও শানদিগের উপনিবেশের আর অনুপ্রবেশের ফলে পিউজাতির স্বজাতীয় শিল্প ও কলাবিদ্যারও এখন কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। পিউদিগের রচিত গান ও সুরেরও অস্তিত্ব এখন নাই।

হারভীসাহেবের রচিত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের চতুর্দশ পৃষ্ঠায় পো-চুই-ইঁ লিখিত চীনদেশীয় গ্রন্থ হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পিউদেশের রাজপুত্র শুনাণ্ট-অ চীনসম্রাটের আনুগত্য গ্রহণ করিবার জন্য, রাজধানী হি-আন্-ফু নগরে গিয়াছিলেন। তাঁহার পিউ অনুচর-

গণ চীনরাজসভায় সংস্কৃতভাষায় রচিত গান ও মনোমুগ্ধকর নৃত্য করে। চীনসম্রাট ওই সংগীতে ও নৃত্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজকুমার শুনাণ্ট-অ ও তাঁহার পিতা পিউরাজকে চীনরাজ্যের এক উচ্চ-উপাধি প্রদান করেন।

ব্রহ্মদেশের আদিম অধিবাসী বিলুণ্ড। প্রাচীন পিউদিগের মুখে সংস্কৃতভাষায় রচিত গানের উল্লেখে পিউদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে কিরূপ নিকট সম্পর্ক ছিল তৎসম্বন্ধে মনে স্বভাবতই নানাপ্রকার প্রশ্ন উত্থিত হইবে। ১০৪৯-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ অনরথ পাগানের রাজা ছিলেন। হারভী তাঁহার 'হিস্টরি অভ বার্মা'র ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: Bricks bearing his 'seal', a Sanskrit text, have been found as far apart as Pungling in Mimbu district and Yawanti, West of Rangoon। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রহেলিকাপূর্ণ প্রশ্নসমূহের বিচার বর্জন করিয়া, আমরা নির্বিঘ্নে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে খ্রীষ্টপূর্ব অন্তত তৃতীয় শতাব্দী হইতে ভারতীয় ভাষা, কৃষ্টি ও সভ্যতা প্রাচীন ব্রহ্মদেশের পিউদিগকে এত অধিক পরিমাণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেও তাহাদের সংগীতে সংস্কৃতভাষায় রচিত গান এমন-কী রাজগৃহে পর্যন্ত সমাদৃত হইতেছিল।

চীন ও ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ীভূত হইবে। সকলেই অবগত আছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয়গণ ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ উপকূলে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কাম্বোজ, তক্কালা, তটোন্, প্রোম ও পিগু প্রদেশে তাঁহারা পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য, চিত্র, সংগীতাদি, কলাবিদ্যা তাঁহারাই ব্রহ্মদেশে আনয়ন করিয়া পিউদেশের সভ্যতা গঠিত ও পরিপুষ্টিত হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। পিউদেশে বহুদিন অবস্থানের ফলে এবং বাণিজ্যব্যপদেশে পিউদিগের সহিত এইসকল ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের সংমিশ্রণবশত ভারতীয় কৃষ্টি ও ভারতীয় সংগীতপদ্ধতি দ্বারা ব্রহ্মদেশীয় সংগীতপদ্ধতিও যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না। বর্তমান ব্রহ্মদেশীয় সংগীতে অদ্যাপি তালাইও-তান্ নামক এক মধুর রাগিণী বিদ্যমান আছে। উহা পিউদেশের ঔপনিবেশিক তালাংদিগেরই গানের সুর আর তান ব্রহ্মদেশীয় শব্দ। ইহার অর্থ শব্দ, সুর বা স্বর। সংস্কৃত তান অর্থাৎ স্বরের বিস্তার-শব্দ ব্রহ্মদেশীয়গণ গ্রহণ করিয়াছে।

ধর্মসংগীত ও ঐতিহাসিক সংগীত

পূর্বোক্ত এই তিমিরাচ্ছন্ন যুগের পর খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আমরা ব্রহ্মদেশে যে সংগীতের সন্ধান পাই, তাহা প্রধানত ব্রহ্মভাষায় রচিত ধর্মসংগীত ও ঐতিহাসিক সংগীত। ১০৪৪-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পাগানের মহারাজ অনরথের রাজত্বকাল ব্রহ্মদেশীয় ভাষা সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হয়। তাহার পর, তাঁহার পরবর্তী রাজন্যগণের রাজত্বকালে বহুবিধ পালিগ্রন্থ ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইতে থাকে। এই সময় হইতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমরা ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় রচিত বহুপ্রকার কবিতা এবং টে-মী, নে-মী জানাকা, ওয়েতান ডাইয়া প্রভৃতি বহু নাট্যগ্রন্থ ও বহুবিধ নাট্যসংগীতের পরিচয় পাই। অল্প অনুসন্ধান করিলেই ওই সময়ের রচিত অন্যান্য সংগীতে বা গীতিকবিতায় ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন ইতিহাসের তদানীন্তন রাজা ও প্রজাদিগের সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশীয় কবিগণ তখন রাজ্যের কোনো সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা বা ব্রহ্মদেশীয় রাজাদিগের কীর্তিকাহিনী বা সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরাদির নির্মাণ ও বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত গল্পাদি অবলম্বন করিয়া সংগীত রচনা করিলেন। পূর্বকালে বঙ্গদেশের ভাটগণ যেমন বাঙালির কোনও প্রসিদ্ধ ঘটনা (যথা বর্গীর হাঙ্গামা) অথবা কোনও ধনী বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনও অসাধারণ আচরণ অবলম্বন করিতেন। যেমন,

(ছিলেন ললিতবাবু / হলেন কাবু, /দারুণ গুপ্তির বিষে ইত্যাদি বাঙলার ভাটগান) রচনা করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেন, ব্রহ্মদেশের সংগীতরচয়িতাগণও সেইরূপ তালাং ও ব্রহ্মদেশীয় রাজাদিগের কীর্তিকাহিনী এবং রাজ্যের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের পারিবারিক ঘটনা বর্ণনা করিয়া, সংগীত রচনা করিতেন। আনেইন ও জাট গায়কদিগের কণ্ঠে এইসকল সংগীত ব্রহ্মদেশের নগরে-নগরে গীত হইত। দেশের লোকেরাও এইসকল সংগীতের আদর করিত। রাজারা এইসকল সংগীত দ্বারা স্বরাজ্যে বা পররাজ্যে নিন্দিত হইবার ভয়ে কুকার্য করিতে সাহসী হইতেন না। বাঙলার মালদহ জিলার গম্ভীরা গান তথাকার জনগণের হস্তে এইরূপ একটি অস্ত্র। ব্রহ্মের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৪২৭-৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিরব্রহ্মে মোহ্নীন্-তাডো নামক এক রাজা ছিলেন। জ্যোতির্বিদদিগের পরামর্শে তিনি তদানীন্তন ব্রহ্মদেশীয় পঞ্জিকার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন। পুরাতনপন্থী ভিক্ষুগণ এই পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন এবং রাজাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, পঞ্জিকা পরিবর্তন করিলে ঐ পরিবর্তনের ফলে শীঘ্রই রাজার মৃত্যু সংঘটিত হইবে। রাজা মোহ্নীন-তাডো এই ভয়প্রদর্শনে ভীত না হইয়া উত্তর দেন—যদি মৃত্যু হয় হইবে। কিন্তু মৃত্যু-ভয়ে আমি কর্তব্যকার্য করি নাই, এই অপবাদ দেশের সংগীতে স্থান দেওয়াইতে আমি ইচ্ছা করি না। মোহ্নীন্-তাডো পঞ্জিকার পরিবর্তন করেন এবং উহার কয়েকমাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৩০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজপুত্র তিহাতু চীনসৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ব্রহ্মদেশে এই উপলক্ষে এক বৃহৎ জয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাজকুমার তিহাতু চীনঅভিযান সম্বন্ধে সংগীত রচনা করিয়া স্বয়ং এই উৎসবে ওই সংগীত গান করেন। এই গানে চীনদেশীয়দিগের ব্রহ্মদেশ আক্রমণের এক সুন্দর ঐতিহাসিক বর্ণনা আছে।

ট অউ লাদি লা দি
ইয়াইঙ্ ইয়াইঙ ল ইয়াইঙ্ ইয়াইঙ্।
মিয়া মো ইওয়াদি
ফিয়াইঙ্ ফিয়াইঙ্ ল ফিয়াইঙ্ ফিয়াইঙ্॥
ইত্যাদি

(এই গানের প্রতি ছত্রের শেষের শব্দের সহিত একান্তরিত অন্য ছত্রের শেষের যে মিল আছে তাহা লক্ষ করিবেন।)

আরাকানের রাজা হয়ক্রর রাজত্বকালে (১৪৫৫-১৪৬৯ খ্রী) আড়ু-মিন্ উ নিও এইরূপ ঐতিহাসিক সংগীতরচনায় আরাকানে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'ইয়াখাইও-মিনতাম্বি-এ জীন্' নামক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সংগীত অদ্যাপি ব্রহ্মদেশবাসীর মনোরঞ্জন করিতেছে।

নওয়া ডেজী (১৫৫০-১৫৯৯ খ্রীঃ) নামক এক নির্বাসিত রাজকর্মচারী তাউঙ্-ডাট্ বিদ্রোহের বর্ণনা করিয়া অতিসুন্দর এক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ওই সংগীতে রাজসৈন্যের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনায় যে সুর সংযোজিত হইয়াছিল, তাহা খুবই উদ্দীপনাপূর্ণ। নওয়া ডেজীর রচিত 'আউঙয়া মিন্-তাম্বি-এজীন্' নামক গানও বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছিল। ঐ সংগীতে শ্যামকুমারীর বিলাপসংগীতগুলি অত্যন্তই শ্রুতিমধুর ও করুণরসপূর্ণ।

সুপ্রসিদ্ধ মিয়াওডী মিন্‌জী উহা ব্রহ্মদেশের সংগীতবিশারদগণের মধ্যে অমর হইয়া রহিয়াছেন। মিন্ গৌন্ মন্দির নির্মাণ উপলক্ষে উহা 'কৌন বৌন পড়মী' নামক প্রসিদ্ধ সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ঐ গানে উহার অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া ব্রহ্মসম্রাট তাঁহাকে মিয়াওডী-মিন্‌জী উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার রচিত "চুমাচ্ছানা তচ্ছিন" (উপাসনাসংগীত), "বউঙ ছাউঙ" শীর্ষক রাজকীয় নৌযাত্রার গান (কাউঙ লা জ্যো), "জয়া মিও"

শীর্ষক রাজকীয় নৌ-চালনার গান (কাউঙ-দিন-জ্যো) এবং 'ছেইন লে-লে পিয়া' শীর্ষক রাজতরী তীরসংলগ্ন করিবার গান (কাউঙ্ ছাই জ্যো) স্বরমাধুর্যে ও বর্ণনাগৌরবে ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

ব্রহ্মদেশের রাজধানী আভা নগরে মাউঙ চ্যাউক লৌন নামক এক সংগীতপারদর্শী কবি ছিলেন। তাঁহার সংগীতে আভার এক রাজরানী তাঁহার প্রতি এত আসক্ত হইয়াছিলেন যে মাউঙ চ্যাউক লৌন্ প্রাণদণ্ডের ভয়ে আভা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন। রেঙ্গুনে বাস করিবার সময়ে তিনি পা-পিঙ সুরে কয়েকটি বিরহ-সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় গায়কেরা ব্রহ্মের রাজধানী আভাতে ঐসকল সংগীত গান করে। বিরহবিধুরা রানী ঐ গান শুনিবামাত্র উহা মাউঙ চ্যাউ লৌন্-এর রচিত সংগীত বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং প্রিয়বিরহে আত্মহারা হইয়া বিষপানে স্বীয় জীবনলীলা অবসান করেন।

মহারাজ বাজিড্ ফায়ার পুত্র কুমার পিন্জী মিনতা সংগীতে এবং ঐতিহাসিক সংগীতরচনায় অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সুরগুলি বিশেষত তাঁহার আয়ুড়িয়া সংগীতগুলি, ব্রহ্মদেশের সংগীতে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশের সংগীতসমাজে তিনিও অমর হইয়া রহিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি সকল সংগীতরচয়িতার কীর্তি ও তাঁহাদের রচিত সংগীতের আলোচনা করিতে অসমর্থ। মহারাজ অনরথের রাজত্বকাল হইতে আলা উঙ্ ফায়া বংশের শেষ রাজা মহারাজ তিব'র রাজত্বকাল পর্যন্ত অনেক সংগীতরচয়িতা, সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও গায়িকা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সংগীত ও সুর ব্রহ্মদেশে যেরূপ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, বঙ্গদেশের গায়কগায়িকাদিগের অদৃষ্টে সেরূপ সুখ্যাতি ও সৌভাগ্য লাভ হয় নাই।

ব্রহ্মদেশীয়গণের সংগীতপ্রিয়তা

ব্রহ্মবাসিগণ অত্যন্তই সংগীতপ্রিয়। তাহাদিগের প্রত্যেক উৎসবে গানবাদ্যের প্রচুর বন্দোবস্ত থাকে। তাহাদিগের শোভাযাত্রায়, পর্বানুষ্ঠানে, পুত্রকন্যার জন্ম-কর্ণবেধন ও বিবাহ উপলক্ষে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনায়, ধান্যরোপণে, নৌচালনায়, এমনকী ভিক্ষুকের ভিক্ষায় পর্যন্ত তানলয়যুক্ত গানবাদ্যের ব্যবস্থা হয়। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর অন্তাভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ সপ্তশত বৎসরে ব্রহ্মদেশীয়গণ নানাপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লবে যথেষ্ট অশান্তি ও দুঃখভোগ করিয়াছে; কিন্তু তথাপি এই অরাজকতা ও অশান্তির মধ্যেও তাহাদিগের সংগীতপ্রিয়তা ও সংগীতবিদ্যার চর্চা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন সাইম্স্ ইংরেজের দূত হইয়া ব্রহ্মদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ও সময়ে রেঙ্গুনে ও অমরাপুরানগরে তিনি ব্রহ্মদেশীয় নাট্যগীত ও আনেইন সংগীত শুনিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:

The Burmans are extremely fond both of poetry and music. They have epics as well as religious poems of high celibrity and they are fond of recit ng heroic numbers of exploits of their Kings and Generals.

Music is a science held in high estimation throughout the Burman Empire, and is cultivated at the present day more generally than in India. The Royal Library of Amarapure is said to contain many valuable treatises on the art. Some of the musicians display considerable skill and execution and the softer airs are pleasing even to the ears unaccustomed to such melody.

মেমিও শহরের খিন্ খিন্জী বলেন: সাইম্স্ সাহেবের এই উক্তি অনেক পরিমাণ সত্য। ভারতীয় বা ইওরোপীয় সংগীতের সুর তদ্দেশীয় লোকের নিকট যতই উৎকৃষ্ট বা শ্রুতিমধুর হউক না কেন, ব্রহ্মদেশীয় সংগীত ব্রহ্মদেশের অধিবাসিগণের প্রকৃতি, সংস্কার ও মনোবৃত্তির পক্ষে যত উপযোগী, বিদেশীয় সংগীত কখনই সেরূপ উপযোগী হইবার স্পর্ধা করিতে পারে না।

ব্রহ্মদেশের গানবাদ্যে যেমন সংগীতকলাকুশল ব্যক্তির অভাব ছিল না, শ্রোতাদিগের মধ্যেও তেমনি সমঝদার লোকেরও অভাব ছিল না, এখনও নাই। গান ও বাদ্যে ব্রহ্মদেশীয়রা সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। রঙ্গমঞ্চে বিলাপসংগীত শুনিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অশ্রুপাত করে। আবার আনন্দসংগীতের সুরস্পন্দনেও তাহারা অসামান্যভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ইহাদের জাতীয়সংগীত বা national anthem, রণসংগীত ও দেশপ্রেমসূচক সংগীতগুলি গম্ভীর ও উত্তেজক। যুদ্ধ ও কুস্তিখেলায় উত্তরব্রহ্মে কখনো-কখনো রণবাদ্য বাদিত হয়। ওই বাদ্য শুনিয়া খেলোয়াড়েরা তাল ঠুকিয়া বেপরোয়াভাবে যুদ্ধপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের মুখ, চক্ষু ও শরীরের মাংসপেশীগুলি পর্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে।

ব্রহ্মদেশের প্রেমসংগীত ও বিরহসংগীতগুলি অত্যন্তই মধুর এবং হৃদয়স্পর্শী। এইসকল গান অতি কোমল ও সুললিত ভাষায় রচিত হয় এবং সুকরুণ সুরের সহিত ওইসকল সংগীতের রচনাভঙ্গির অতিস্বাভাবিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়। ব্রহ্মদেশীয় নাট্যমঞ্চে এইসকল গানের যথেষ্ট আদর আছে এবং গায়ক ও গায়িকারা সুকণ্ঠ হইলে শ্রোতারা বিমুগ্ধহৃদয়ে ও বিনিদ্রনয়নে সমস্ত রাত্রি পোয়ে-প্রাঙ্গণে বসিয়া থাকে—বিরক্তি বোধ করে না।

ব্রহ্মদেশীয় ধর্মসংগীতগুলিও ওইরূপ চিত্তাকর্ষক। সুগায়কের কণ্ঠে পালিশব্দমিশ্রিত এইসকল ধর্মসংগীত শুনিয়া শ্রোতাগণ মুহুর্মুহু অশ্রুপাত করিয়া থাকে। মিয়াওডী মিন্জী রচিত "ঠুমাচ্ছা না তচ্ছিন্" ইহার এক দৃষ্টান্ত।

এতদ্দেশীয় ঙ্গে জ্যিন বা বিলাপসংগীতগুলি বিদেশীদিগের নিকট প্রথমত অতিদীর্ঘ ও অসমপৃক্ত মনে হয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়দিগের নিকট এইসকল বিলাপসংগীতই সর্বাপেক্ষা প্রিয় সংগীত। রোদনের ভঙ্গি ও ক্রন্দনকালে ব্যবহৃত শোকপ্রকাশের শব্দাদি (আ মা লে বা মান্দ্রাজী ইয়ো ইয়ো প্রভৃতি শব্দ) সকল দেশেই বিভিন্ন। বিদেশীয়গণ ব্রহ্মদেশীয় বিলাপসংগীতের আশ্মালে বা হিক্কাযুক্ত রোদনধ্বনি শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। পূর্বে বঙ্গদেশীয় যাত্রায় রোরুদ্যমানা অভিনেত্রীগণের রোদনভঙ্গিকে সভ্যতাগর্বিত ইওরোপীয়গণ যেমন উপহাস করিতেন, ব্রহ্মনাট্যমন্দিরের রোরুদ্যমানা গায়িকার রোদনেও তাঁহারা তদ্রূপই উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু এবিষয়ে বিদেশীগণের উপহাস ও কর্কশ সমালোচনা ব্রহ্মদেশীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ সম্পূর্ণ ই উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের জাতি, শ্রেণী ও রূপ

রাগরাগিণী বিচার না করিয়া বাঙলার গানগুলিকে যেমন ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন, বাউলিয়া প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, ব্রহ্মদেশীয় সংগীতগুলিকেও সেইরূপ মোটামুটি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম—জাট্ বা আট্সংগীত
দ্বিতীয়—আনেইন সংগীত
তৃতীয়—ইয়েন সংগীত
চতুর্থ—যুদ্ধসংগীত, শোভাযাত্রা-সংগীত, নৌসংগীত প্রভৃতি বিশুদ্ধ দেশী সুরে গীত খাঁটি দেশী সংগীত। ঘুমপাড়ানি গানগুলিকেও এই শ্রেণীর সংগীতের সহিত রাখা যায়।

প্রথমোক্ত নাট্যসংগীতের ছন্দ, ভঙ্গি, ভাষা ও স্বরূপ অন্যান্য সংগীত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নাট্যক্রীড়া সুসম্পন্ন করিবার জন্য এবং অভিনেতাদিগের মনোভাব প্রকট করিবার জন্য এইসকল গানে চরিত্রোপযোগী

সুর ও গতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নাট্যবস্তু ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য জাট্‌সংগীতে পা পিয়া তান্, আয়ুড়িয়া-তান্, ডেইন্-তান্ বা তালাইঙ-তন্ প্রভৃতি বিশিষ্ট-বিশিষ্ট প্রকৃতির সুর সংযোগ না করিলে সে-গান চিত্তাকর্ষক হয় না। এক সংগীতের সহিত অন্য সংগীতের ভাবসম্বন্ধও অবিচ্ছিন্ন রাখিতে হয়।

কিন্তু দ্বিতীয়াখ্য আনেইন্ সংগীতে এরূপ সম্বন্ধ বা সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। আনেইন গানগুলিকে আমাদের দেশের বৈঠকি গানের ন্যায় পারিপার্শ্বিক-ঘটনা-নিরপেক্ষ সম্পর্কবিহীন সংগীত। জাটসংগীতগুলিকে আদি, বীর, করুণ ও হাস্যরস সমাপ্লুত করিবার তদুপযোগী সুর ও ভাষা নির্বাচন করিতে হয়; কিন্তু আনেইন্ পোয়েতে বীর ও করুণ-রসের সংগীত গাওয়া অশোভন। অনাবিল আনন্দজনক হাস্যরস ও চিত্তপ্রসন্নকারক শান্ত রসই আনেইন সংগীতের মূল ও স্থায়ী ভাব। বর্তমানের আনেইন সংগীতে স্বদেশী সংগীত বা "শোয়েপ্যাজী" সংগীতগুলিও আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধজয়জনিত আনন্দ-সংগীত, সামাজিক আচার-ব্যবহারের সমালোচনাযুক্ত শ্লেষাত্মক পদ্য, হাসরস-পরিপূর্ণ গ্রাম্য সংগীত এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসা ও কীর্তি-কাহিনীপূর্ণ বিবৃতিই আনেইন সংগীতের প্রধান উপাদান ছিল। শোকসংগীত আনেইন পোয়েতে কখনও গাওয়া হয় না।

পুতুলনাচের সংগীত জাট সংগীতেরই অনুরূপ। উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও সাজসরঞ্জামের অভাবে যে নাটকীয় দৃশ্য পূর্বে জাট পোয়েতে দেখানো যাইত না, পুতুলনাচে পুতুলের সাহায্যে তাহা প্রদর্শন করা যাইত বলিয়াই পূর্বে পুতুলনাচের আদর ছিল। দৈত্য, বিলু, নাগ, ড্রাগন প্রভৃতির অদ্ভুত মূর্তি রঙ্গমঞ্চে আনিয়া, দর্শকগণের মনে ভীতি, অদ্ভুত ও বীভৎস রসের সঞ্চার করিবার জন্য, পুতুলনাচের গানগুলি উপযুক্ত ভাষায় রচিত হয় ও তদুপযোগী সুরে প্রদত্ত হয়। এখন আর পুতুলনাচের আদর নাই; সুতরাং ঐ পুতুলনাচের সংগীতগুলিও লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

তৃতীয় ইয়েন সংগীত। ইয়েন পোয়েতে এইসকল সংগীত গীত হয় বলিয়া, ইহাকে ইয়েন সংগীত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের জাট ও আনেইন সংগীতগুলি সাধারণত গায়ক-গায়িকারা একা-একাই গাহিয়া থাকে; কিন্তু ইয়েন সংগীত সেরূপ নহে। বারো জন, ষোল জন বা আঠারো জন গায়ক-গায়িকা এক হইয়া সমস্বরে এইসকল গান গাহিয়া থাকে। এই গানের সুর ও ছন্দ জাট্ আনেইন সংগীতের সুর ও ছন্দ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও প্লুতস্বর সমন্বিত, বীর ও গম্ভীর অথবা দ্রুত ও স্বাভাবিক গতিসম্পন্ন, ঐক্য-তানবিশিষ্ট এই গায়কসংঘের গান, সুসংযত অঙ্গ-সঞ্চালনসমন্বিত নৃত্যের সহিত, অত্যন্তই মনোরম হইয়া থাকে।

কোন বিশিষ্ট বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অভ্যর্থনায় এইসকল সংগীত সাধারণত গাওয়া হয়। স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাহাদিগের বাৎসরিক উৎসবেও এখন ইয়েন সংগীত গাহিয়া থাকে। সমরূপ, সমবয়স্ক, সমপরিচ্ছদ ও সমনৃত্যসম্পন্ন তরুণতরুণীদিগের সমতানবিশিষ্ট ইয়েন সংগীত এখন ব্রহ্মদেশের সর্বত্রই দর্শক ও শ্রোতাদিগের হৃদয়গ্রাহী হইতেছে।

চতুর্থ শ্রেণীর সংগীতের মধ্যে মৌসংগীত, গ্রাম্য সংগীত ও জয়োৎসব সংগীতগুলিই চিত্তাকর্ষক।

নৌসংগীতের মধ্যে বঙ্গদেশের ভাটিয়ালি গানের অনুরূপ দেশীয় সুর ও দেশীয় ছন্দবিশিষ্ট গানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে বিস্তৃত নদীবক্ষে চন্দ্রকিরণ-লাঞ্ছিত ঊর্মিমালার লীলায়িত নৃত্যরসে ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের হ্লেতান্ বা নৌসংগীতের জন্ম হইয়াছিল, তাহার অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে এবং প্রত্যেক চরণভঙ্গিতে সেই জ্যোৎস্নামণ্ডিত ঊর্মিচঞ্চল গতি ও সৌন্দর্য মূর্ত হইয়া হ্লেতান-সংগীতের বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে (হ্লে=নৌকা; তান=সুর সংগীত, হ্লেতান=নৌসংগীত বা

নৌবাহিনী)। নাবিক জীবনের শতসহস্র দিবাস্বপ্নে রণযানবিক্ষুব্ধ ইরাবতীর শতসহস্র যুদ্ধচিত্রে, এবং সিংহাসনচ্যুত হতভাগ্য রাজাদিগের উষ্ণশ্বাসের সাহচর্যে যে হ্লেতান বর্ধিত হইয়াছিল সেই স্বপ্ন, চিত্র ও সন্তাপই ব্রহ্মদেশীয় নৌসংগীতের বৈশিষ্ট্য।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন সাইমস্ অমরাপুরায় কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তথাকার হ্লেতান সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন:

The people in our neighbourhood were farmers and gardeners who cultivate pulses, greens, onions, and such vegetables as Burmese use. These articles they transport at an early hour across the lake to the city, and bring home the products at night. The business is performed mostly by females. One man—commonly a person in years—accompanies each boat. He acts as steerman while the women, usually from 10 to 14 in number, sitting with their legs across, row short oars. When they set out in the morning, they proceed in silence, but returning at night they join in chorus and time the stroke of their oars to the bars of their song. We were serenaded every evening from dusk till 10 o'clock by successive parties of these joyous females whose strains, though unpolished, were always melodious and pleasing.

সাইমস্ যাহা শুনিয়াছিল তাহা অশিক্ষিত গ্রাম্য নৌসংগীত। সুশিক্ষিত গায়কগায়িকাদিগের কণ্ঠে এই সকল হ্লেতান মনোমুগ্ধকর।

জাতি

ব্রহ্মদেশীয় বর্মিগণ বিমিশ্র ইন্দোনেশীয় জাতি। সুতরাং তাহাদের গানের সুরগুলিও মিশ্রসুর। তালাং, কাম্বোডিয়া, আয়ুড়িয়া (শ্যাম), [১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বিয়ানাউঙ অযোধ্যা (শ্যামদেশ) জয় করিয়া শ্যামদেশীয় অভিনেতা অভিনেত্রী ও গায়কদিগকে বন্দী করিয়া ব্রহ্মদেশে লইয়া আসেন। তাঁহারাই এদেশে ইয়োড়ীয়া বা আয়ুড়িয়া সুরের প্রবর্তন করেন —(হার্ভীর ব্রহ্মদেশের ইতিহাস পৃ ১৬৮] পিংজী (চীন) ও ব্রহ্মদেশীয় নানাপ্রকার সুরের সংমিশ্রণে তাহাদিগের গানের সুর তৈয়ারি হইয়াছে। কোন কোন সংগীত এখনো অমিশ্র দেশীয় সুরে গাওয়া হয় বটে কিন্তু এরূপ বিশুদ্ধ সুরের সংখ্যা নিতান্তই কম।

রূপ

বাঙলার সারেগামা প্রভৃতি সুরসপ্তকের ন্যায় ব্রহ্মদেশেও সুরসপ্তক ব্যবহৃত হয়। তাহারা সারেগামা প্রভৃতিকে হ্সিন্-লৌন্ প্রভৃতি নামে অভিহিত করে। যথা:

সা=হ্সিন্‌লৌন্; ঋ=আউপিয়ান; গা=পে-লে; মা=মিন্‌ম্যাইন; পা=ডুল্‌কা দোয়ে; ধা=ছাউ-তোয়ে-নিও; নি=পী-ড-পিয়ান্॥

সা (হ্সিন্‌লৌন্) স্বরকে বেসিক নোট (মূলস্বর) করিয়া তাহারা ঢ্যো, বোয়ে ও তচ্ছিম-গাম প্রভৃতি রাগিণীর গান করে। রে (আউ-পিয়ান) স্বরে খরজ করিয়া পাপিও, নাটতান্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ রাগিণীর গান গাহিতে হয়। গা (পে-লে) স্বরে আয়ুড়িয়া তান্, ডেইগা তান্, ডইন্ তান্ প্রভৃতি সংগীত গাওয়া হয়। সান মান মিনজাইন স্বরে তালাইং তান্, টে-ডে তান্, শী-ছে-বো-তান্ প্রভৃতি সংগীত গীত হয়। ব্রহ্মদেশীয় সংগীতগুরু বলেন, পা (ডুলকা ডোয়ে), ধা (ছাউ-তোয়ে-নিও) এবং নি (পী-ড-পিয়ান) এই তিনটি স্বার গেয় রাগিণী এখন ব্রহ্মদেশে নাই। লুপ্ত বা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।

বাঙলা ভাষায় রাগরাগিণী বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ব্রহ্মদেশীয় সুরগুলিকে সেরূপ রাগরাগিণীতে

বিভক্ত করা হিন্দু সংগীতশাস্ত্রের ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ হইবে। তথাপি আমি অল্প পূর্বেই এইসকল সুরকে পাপিও রাগিণী, নাটরাগ, ডেইগা রাগিণী প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মদেশীয় গানে ভারতীয় হিন্দু সংগীতের ন্যায় পুরুষ ও স্ত্রীভাবশিষ্ট কোন রাগিণী বা রাগিণীর শ্রেণী-বিভাগ নাই। আদি, বীর, করুণ প্রভৃতি রসভেদে ব্রহ্মদেশীয় গায়কেরা তাহাদিগের গানে বিভিন্ন জাতীয় সুর সংযোজন করিয়া রসপ্রকাশের সুবিধা করিয়া থাকে। 'বাদী' 'সংবাদী' ও 'বিবাদী' প্রভৃতি বিধি-নির্দিষ্ট স্বরের মিলন বা বর্জনের বিচার ইহারা করে না। স্বাভাবিক বা instinctive সুরজ্ঞানই তাহা-দিগের সুর-মনোনয়নের একমাত্র নায়ক।

মতান্তরে, ব্রহ্মদেশীয়গণ বলেন যে পূর্বোক্ত কায়া-তান্, পাপিও তান্, ডেইপা তান্ প্রভৃতি সুরের ভাব ও স্বরূপ পরস্পর হইতে এত বিভিন্ন যে শুনিবা-মাত্রই তাহাদিগের জাতিভেদ পরিষ্কাররূপে প্রকটিত হয়। ওইসকল সুরের প্রত্যেক সুরের যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা গাহিবার সময়ে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। অন্য সুরের সহিত মিশ্রিত করিলে পূর্বোক্ত সুরের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হইয়া এক জারজ সুরের উৎপত্তি হয়। সুতরাং ওইপ্রকার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সুরগুলিকে বাঙলাভাষায় ব্রহ্মদেশীয় রাগ ও রাগিণী বলিলে দোষ হয় না। বরং বিচার করিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দুসংগীতশাস্ত্রে যেমন কোনো বিশিষ্ট ভাব ও রসকে সংগীতে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য সুরের পারম্পর্য গঠিত করিবার নিয়ম ও প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, ব্রহ্মদেশীয় সংগীতেও সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কোনো-কোনো বিশিষ্ট সুরে বিশিষ্ট প্রকার স্বরপরম্পরার সংযোজন করিবার নিয়ম আছে। বিশিষ্ট-বিশিষ্ট ভাব ও রসের সৃষ্টির জন্য স্বরপরম্পরার সম্মিলন হিন্দুসংগীতশাস্ত্রে রাগ বা রাগিণী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মদেশীয় ওই সুরগুলিকে হিন্দুসংগীতশাস্ত্র অনুসারেও রাগ ও রাগিণী বলা দূষণীয় হইবে না।

তদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের সুরগুলিকে হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত রাগরাগিণীতে বিভাগ না করা গেলেই যে সেই সুরগুলি ত্রিভুবনের অস্পৃশ্য, এরূপ মত পোষণ করা ভারতবাসীদিগের পক্ষে অনুচিত।

ইহার উত্তরে হিন্দুসংগীতশাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন—যদি হিন্দু সংগীতের সহিত ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের কোনও অঙ্গাঙ্গিক বা পিতৃ-সন্তান সম্বন্ধ না থাকিত, তবে আমরা ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত সংগীত বিষয়ে কোন তুলনামূলক আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। ঐরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এই আলোচনায় হিন্দু সংগীতশাস্ত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছে। তাহাদিগের পুরাতন শ্রেষ্ঠ সুরগুলি, ভারতীয় ধ্রুপদেরই সন্তানসন্ততি।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি প্রণিধানযোগ্য কথা আছে। শুদ্ধ কাব্যশাস্ত্রোক্ত রস ও ভাব সৃষ্টি করিবার জন্যই হিন্দুসংগীতের রাগরাগিণী সংগঠিত হয় নাই। তাহা অতিশয় তুচ্ছ বিষয়। কারণ ঐরূপ সুরসংগঠন কেবলমাত্র মানুষের চিত্তরঞ্জনের জন্যই গঠিত হয়। কিন্তু হিন্দু সংগীতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণই অন্য-রূপ। সংগীতের সহযোগেই ভগবানের সহিত গায়কের চিত্তবৃত্তির পরম লয় সাধন করিয়া এক শাশ্বত ঘন-আনন্দ লাভ করাই হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সংগীতের উদ্দেশ্য। তাঁহারা বলেন যে নাদব্রহ্মের ধ্যানে হিন্দুর রাগ-রাগিণীর উদ্ভব এবং নাদব্রহ্মের সহিত চিত্তের নিবিড় লয় বা সমাধিতেই তাহার পরিণতি। ব্রহ্মদেশীয় সংগীতে হিন্দু সংগীতের এই মহৎ উদ্দেশ্য হারাইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মদেশীয়গণ হিন্দু সংগীতজ্ঞদিগের মুখে সংগীতের এই দম্ভপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারেন না। তাহারা বলে, "তোমরা গত দুই হাজার বৎসর যাবৎ লোককে ঐ আধ্যাত্মিকতা ও ও মিসটিসিজম দ্বারা ঠকাইয়াছ। তোমরা নিবৃত্ত হও। তোমাদের ধাপ্পাবাজি এখন প্রকাশ হইয়া গিয়াছে।'

এ কলহ এখন এই পর্যন্তই শেষ করা হইল।

বিভিন্ন সুরের মিশ্রণ সকল দেশেই স্বাভাবিক। পূর্বে আউড়িয়া বা তালাং বা কাম্বোডীয় সুর যেমন স্বচ্ছন্দে ব্রহ্মদেশীয় সংগীতে প্রবেশ করিয়াছিল, এখন ইওরোপীয় সুরগুলিও সেইরূপ ব্রহ্মদেশীয় সংগীতে অবাধে এবং অতিদ্রুতবেগে প্রবেশ করিতেছে। শ্যাম, চীন ও তালাংদিগের সংগীতের সহিত ব্রহ্ম-দেশীয় সংগীতের একটি জাতিসম্বন্ধ ছিল; সুতরাং তাহাদিগের সম্মিলনে কোনও রাক্ষসভাবাপন্ন সুরের উৎপত্তি হয় নাই। বিজাতীয়, অপরিসীম বৈষম্যযুক্ত ও বিসদৃশ প্রকৃতিবিশিষ্ট ইওরোপীয় সংগীতের সংমিশ্রণে ব্রহ্মদেশের এখন সেই রাক্ষসী সুরেরই উদ্ভব হইতেছে। ব্রহ্মদেশীয় যুবক-যুবতীরা এখনও ইওরোপীয় ইন্দ্রজালের অপূর্ব কুহকে মুগ্ধ; ঐ কুহকে ভুলিয়া যে রাক্ষসকে তাহারা এখন স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছে, সেই রাক্ষস একদিন ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের আভিজাত্য ও বংশবৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে।

পূর্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মদেশীয় সুরগুলিকে নির্দিষ্ট নিয়মে গাহিতে হয়। সংগীত রচনার জন্যও বহুবিধ নিয়ম নির্দিষ্ট আছে। ব্রহ্মদেশীয় সংগীতশাস্ত্রেরও পুঁথি আছে এবং তাহাতে ঐসকল নিয়ম সূক্ষ্মভাবে লিখিত আছে। এইসকল নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, বিশিষ্ট সমাজে গান গাওয়া অতি গির্হিত কার্য বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজপ্রাসাদে সংগীতবিদ্যাকুশল সংগীত-অমাত্য নিযুক্ত ছিলেন। তিনি গায়কদিগের গানের ভাষা ও সুরের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া, অনুমতি প্রদান করিলে পর ঐ গায়ক বা গায়িকাদিগকে রাজপ্রাসাদে গান গাহিবার অধিকার দেওয়া হইত। সুতরাং বিজাতীয় সুর মিশ্রণ করিয়া ব্রহ্মদেশীয়গানের আভি-জাত্য হরণ করা, ব্রহ্মদেশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে সম্ভবপর ছিল না। এখন সে রাজাও নাই, সংগীতের সে অভিভাবকও নাই। সুতরাং স্বেচ্ছাচারী গায়কেরও এখন অভাব নাই।

বঙ্গদেশের গানের সহিত ব্রহ্মদেশীয় গানের তুলনা করা কঠিন। তথাপি এ সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথা বলিয়া ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের 'রূপ' দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমত ব্রহ্মদেশীয় গানগুলি বাঙলাদেশের গানের মতো মোনোটোনাস নহে। বাঙালির কানে অবোধ্য হিন্দুস্থানি গজলগুলির সুর যেমন একঘেয়ে লাগে, বর্মীদের কানেও বাঙলা গানগুলি সেইরকম একঘেয়ে শোনায়। প্রতি অন্তরায় একই রকম সুরের পুনঃপুন আবির্ভাবে বর্মীরা বাঙলা গান শুনিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে—নূতন বস্তু খুঁজিয়া পায় না। বর্মীদের গানগুলি সাধারণত সেরূপ নহে। তাহাদিগের গানের প্রত্যেক চরণে নূতন সুর সংযোজিত হয় এবং শেষ চরণেও নূতন সুর রাখিয়া উহার শেষের ভাগ প্রথম চরণের অন্তরভাগের সুরের সহিত মিল করাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ সুরসংযোজনের নিয়ম থাকাতে ব্রহ্মদেশীয় গ্রামগুলি বেশ সজীব ও শ্রুতিমধুর হয়, একঘেয়ে হয় না।

দ্বিতীয়ত ব্রহ্মদেশীয় গানে বঙ্গদেশীয় গানের মতো 'বাদী-সংবাদী'র পরীক্ষা ও রাগরাগিণীর বিচার না থাকাতে, সংগীতের সুর সুমধুর করিবার জন্য ব্রহ্মদেশীয় গায়করা অন্যান্য জাতিসম্বন্ধযুক্ত 'সুরের টুকরা' বা সুরাংশ গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত সংগীতে সংযোজিত করে। ভারতবর্ষীয় ওস্তাদরা এইসকল মিশ্রসুরকে "জংলা" পদবীতে বিশেষিত করিবেন। কিন্তু সে হিসাবে ইওরোপীয় সংগীতগুলিও 'জংলা'; তথাপি সমস্ত পৃথিবীতে তাহাদের অতুল সম্মান।

ব্রহ্মদেশের বাদ্যযন্ত্রে সাধারণত তিন সপ্তক রাখা হয়; কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় গায়কগণ নিম্নসপ্তক বা উদারাতে গান করা পছন্দ করে না। Bass বা baritone শ্রোতাদিগেরও হৃদয়গ্রাহী হয় না। বঙ্গদেশের ওস্তাদেরা যেমন গানের কোনো-কোনো অংশ 'খাদে' গাহিয়া সংগীতের মাধুর্য বৃদ্ধি করেন, ইওরোপীয়গণ যেমন মূল সংগীতের প্রসাধনের জন্য বাদ্যযন্ত্রে বা সহকারী গায়কের কণ্ঠে নিম্নসপ্তকের

grace note দিয়া সুরসঙ্গতি প্রদান করেন, ব্রহ্মদেশীয় গায়কেরা তাঁহাদিগের গানে সেরূপ সুরসঙ্গতি বা হারমনি, অর্থাৎ স্বরসমবায়ের ব্যবস্থা রাখেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের গানের আনুষঙ্গিক বাদ্যে কখনো-কখনো এই বন্দোবস্ত থাকে।

প্রায় ২৯ বৎসর পূর্বে যখন প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্ ব্রহ্মদেশ দেখিতে আসেন, তখন মি. মেরিয়ানো নামক একজন সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মদেশের সংগীত সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে 'A naturel (ধা) সাধারণতঃ বর্মীপুরুষ গায়কদিগের মৌলিক pitch note'।

এই উক্তি সর্বাংশ শুদ্ধ নহে। পুরুষেরা সাধারণত উচ্চস্বরে গান গাহিয়া থাকে সত্য, কিন্তু যে রাগিণী যে ঘাট হইতে গাহিবার নিয়ম আছে, সে রাগিণী তাহারা সেই ঘাট হইতেই গান করে—নিয়ম লঙ্ঘন করে না। শ্রোতারাও উচ্চস্বরে গান গাওয়া পছন্দ করে। সুরের দৌড় যত উচ্চে উপনীত হয়, ততই শ্রোতার নিকট তাহা প্রশংসনীয় হয়। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গায়কদিগের স্বর প্রায়শই তারা গ্রামের contralto পর্যন্ত পৌঁছে। উদারাতে বা মুদারার নিম্নস্বরে গান করা ব্রহ্মদেশীয় গায়কদিকের পক্ষে সুখ্যাতিজনক নহে। সম্ভবত জনসমাকীর্ণ উন্মুক্ত স্থানে গান গাহিতে হয় বলিয়াই তাহারা এত উচ্চস্বরে গান গাহিতে অভ্যাস করে। বৈঠকি গানে বা যে স্থানে শ্রোতাগণ গোলমাল না করিয়া শান্তভাবে গান শোনে, সে স্থানে অত উচ্চ গ্রামের সংগীত নিশ্চয়ই তীব্র ও শ্রুতিকঠোর বলিয়া নিন্দিত হইবে।

ব্রহ্মদেশীয় গায়িকারা মুদারার ঋ অথবা মা স্বরকে basic note বা মূলস্বর রাখিয়া ও তদনুরূপ খরজ করিয়া গান গাহিতে অভ্যাস করে। তাহাতে তাহাদের কণ্ঠে পা-পিও প্রভৃতি রাগিণীর বিলাপসংগীত ও বিরহগানগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়।

ব্রহ্মদেশীয় গানে বাঙলা বা মান্দ্রাজী গানের ন্যায় 'কম্পন' ও 'মূর্ছনা' নাই। গানের শেষ চরণে কদাচিৎ কখনো মূর্ছনা প্রয়োগ করা হয় বটে, কিন্তু বর্মি শ্রোতারা ঐরূপ মূর্ছনাকে অসঙ্গত কসরত বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে।

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা আছে যে ব্রহ্মদেশীয় গানে 'কোমল' সুরের ব্যবহার নাই। এ-ধারণা ভুল। বর্মি গানে 'গমক'ও আছে, কিন্তু কম। 'মীড়' ও 'কম্পনে'র ভাগও খুব কম। 'আশ' যথেষ্ট ব্যবহৃত হয় কিন্তু 'কর্তব' একেবারেই নাই। হিন্দুস্থানি ও বাঙলা গানের 'কর্তব' শুনিয়া বর্মিরা হাসিয়া খুন হয়।

'উপজ' কখনো-কখনো ব্যবহৃত হয়। ছোটো-খাটো 'দম' তাহারা ব্যবহার করে। 'খম' বা বিশ্রাম দেওয়ারও পদ্ধতি আছে। গান বন্ধ করিয়া ওই 'বিশ্রামের' সময়ে গায়ক ও গায়িকারা নৃত্য করিয়া থাকে।

বর্মিগানে বাঙলা বা হিন্দুস্থানি গানের মতো 'সরগম গান' নাই। 'তেলেনা', 'চতুরঙ্গ', 'ত্রিবট' প্রভৃতি ওস্তাদি গান ব্রহ্মদেশীয় সংগীতে মোটেই নাই। বর্মিরা ইহা পছন্দ করে না। যতদূর আমার অভিজ্ঞতা আছে, ভারতীয় গায়ক ভিন্ন অন্য কোনও দেশের গায়করা এইরূপ 'সরগম গান' বা 'তেলেনা' প্রভৃতি অর্থহীন-শব্দমণ্ডিত গান গায় না। অথচ তেলেনা প্রভৃতি গানের পদ, সুর ও বাদ্যের বোলের সহিত সমধ্বনিযুক্ত থাকাতে শুনিতে বেশ মধুর হয়।

ব্রহ্মের শেষ রাজা মহারাজ তিব'র রাজত্বকালে
মান্দালয়ের গবেষকগণ—১৮৮৫

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ব্রহ্মদেশ ইংরেজের শাসনাধীনে আসে। স্বাধীন ব্রহ্মের অধিপতি মহারাজ তিব'কে ধৃত করিয়া রত্নগিরিতে প্রেরণ করা হয়। এই সময় হইতেই ইওরোপীয় কৃষ্টি ব্রহ্মদেশের সংগীতে অবাধে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দকে আমরা ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের ইতিহাসের একটি সীমা-

রেখা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

মহারাজ তিব'র রাজত্বকালে স্বাধীন ব্রহ্মের রাজধানী ছিল মান্দালয় নগরে। শত্রুপরিবেষ্টিত ঐ ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজা, মহারাজ তিব' তখন অল্পবয়স্ক যুবক। বৈদেশিকগণের কূটরাজনীতিজালে জড়িত হইয়া ব্রহ্মরাজসরকারের মহামন্ত্রিগণ তখন কর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় নানাপ্রকার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতেছিলেন। নানাপ্রকার রাজনৈতিক দুর্ঘটনায় ব্রহ্মদেশীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থান মান্দালয় ও উচ্চ ব্রহ্মদেশ তখন অত্যন্তই অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্যের এই দুঃসময়ে কোনো উচ্চ সাহিত্যিক, কবি বা প্রতিভাবান সংগীত-রচয়িতা উচ্চব্রহ্মদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তথাপি সেই অরাজক ও অশান্তিপূর্ণ সময়েও মান্দালয় নগরে সুগায়কের অভাব ছিল না। চ্যাউছে ও মিটিলার শ্যামল শস্যক্ষেত্রের নীরব প্রান্তর, ইরাবতীর বিস্তৃত জলধারার প্রান্তদেশ, ও ব্রহ্মরাজ্যের অন্যান্য প্রদেশ হইতে সংগীতনিপুণ গায়কগায়িকা যশাকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মের রাজধানী মান্দালয় নগরে আগমন করিতেছিল। এইসকল গায়ক ও গায়িকাদিগের বিচিত্র জীবনচরিতে অতিশয় কৌতূহলজনক গল্প আছে। তাহাদিগের এক অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

সর্বাগ্রে মাণ্ডানে-প্রদীপ, ঈন্‌-ড' মালের নাম উল্লেখযোগ্য।

তিনি মহারাজ মিন্‌ডনের রাজত্বকালে মান্দালয়ের রাজপ্রাসাদে গান গাহিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। দৈহিক সৌষ্ঠব, বর্ণগৌরব ও সংগীতকুশলতায় তিনি তদানীন্তন নাট্যসমাজে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে 'মাণ্ডানে-দীপ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ তিব'র রাজত্বকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৩২ বৎসর। যুবতীসুলভ অঙ্গ-সঞ্চালনক্ষমতা ও নমনীয়-দেহ-সাপেক্ষ নৃত্যশক্তি তখন তাঁহার ছিল না। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় সংগীতে তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তখন পরিপক্ক হইয়াছিল। যদিও অন্যান্য যুবতী গায়িকাগণ তখন লোকসমাজে যথেষ্টই আদৃত হইতেছিলেন, তথাপি মাণ্ডানে-দীপ ঈন্‌ ড' মালের সুখ্যাতি মহারাজ তিব'র রাজত্বকালে সম্পূর্ণই অক্ষুণ্ণ ছিল।

অতঃপর সিন্‌-খো-মালের নাম উল্লেখযোগ্য। দৈহিক সৌন্দর্যে সিন্‌-খো-মালের ন্যায় গায়িকা সম্ভবত ব্রহ্মদেশের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন নাই। তাঁহার রূপে যে দাহিকাশক্তি ছিল, তাহাতে কত যে ধনী ও উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি বিদগ্ধ বা বিমোহিত হইয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

চ্যাউছে নগরে এক পর্বোৎসবে সিন্‌-খো-মালের গান হয়। শান্‌ রাজ্যের এক সামন্ত, মালের রূপে বিমুগ্ধ হইয়া মালেকে রঙ্গমঞ্চ হইতে বলপূর্বক অপহরণ করে এবং তাহাকে হস্তিপৃষ্ঠে উঠাইয়া শানরাজ্য-অভিমুখে যাত্রা করে। চ্যাউছের শাসনকর্তা এই সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে শান্‌-সামন্তের পশ্চাদনুসরণ করেন এবং মালেকে উদ্ধার করিয়া চ্যাউছে নগরে লইয়া আসেন। এই সময় হইতে এই মালে সিন্‌-খো-মালে অর্থাৎ হস্তিকর্তৃক অপহৃতা মালে নামে আখ্যাত হন।

সিন্‌-খো-মালের সংগীত উচ্চব্রহ্মদেশে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পুরাতন ক্লাসিক সংগীতেই সিন্‌-খো-মালের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল।

এতদ্ভিন্ন কো গৌন্‌ মালে, মা-ঠোয়ে-মালে, মা-মাচ্ছো প্রভৃতি সমসাময়িক গায়িকাগণের নামও উচ্চ-ব্রহ্মে অমর হইয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ মান্দালয়বাসীদিগের মুখে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সুখ্যাতি শুনা যায়।

গায়কদিগের মধ্যে মাউঙ-তা-বিয় ও ছয়া ট্‌ তদানীন্তন সংগীতবিদ্যাবিশারদগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মং-তা-বিয় অসাধারণ সংগীত-কলাবিৎ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার স্বরচিত গান ও অভিনয়পটুতা ব্রহ্মদেশের গৃহে-গৃহে প্রশংসিত হইত। মহারাজ তিব'র রাজত্বকালে ইনি জীবিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার রচিত গান ও অভিনয়পদ্ধতি তাঁহার

শিষ্যগণ সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন।

রাজপ্রাসাদে উ-কোনিয়া ও উ-কের রচিত গানের অত্যন্ত আদর ছিল। সুর ও শব্দগৌরবে ইহাদিগের রচিত সংগীত এখনও অতুল সুখ্যাতি-সহকারে ব্রহ্মের রঙ্গমঞ্চে আদৃত হইতেছে।

এ প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়ের বিবৃতি নির্ভুল বা নির্দোষ হইয়াছে এরূপ দম্ভ করিবার সাহস আমার নাই। সহৃদয় পাঠকগণ ইহার ভ্রমপ্রমাদ মার্জনা করিয়া গ্রহণ করিলে অনুগৃহীত হইব।

* * *

ব্রহ্মদেশীয় গানের বিভিন্ন-বিভিন্ন সুর নির্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সুরগুলি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ এবং পরস্পর হইতে এত বিভিন্ন যে একের সহিত অন্যের পার্থক্য সহজেই ধরিতে পারা যায়। ব্রহ্মদেশীয় গানের আরো একটি বিশেষত্ব আছে। যে সুরে গাহিতে হয় তাহার গঠন ও ছন্দপ্রণালীও ঐ সুর অনুসারে বিভিন্ন থাকে। কবিতার ছন্দ দেখিয়াই পরিপক্ব গায়কেরা বুঝিতে পারে যে ঐ কবিতা কোন্ সুরে গাহিতে হইবে:

১. চ্যো, ২. চ্যাবয়, ৩. কা-ছিন্, ৪. আইন্-ছিল্, ৫. তিচ্ছিন্-খান্, (উচ্চারণ তহিন্-পান) ৬. তা-ছিন্, ৭. এঃ (নাটতাল ও ১২ রকমের রাতি-এঃ), ৮. নাট ইয়াইঙ্ (নাটতাল), ৯. ইয়া-কান্, ১০. পা-পিয়ো, ১১. টেঃ বোয়ে, ১২. ইয়ো-ডাইয়া (শ্যাম-দেশীয়), ১৩. টলাইঙ্-তান, ১৪. করিন অ-তান, ১৫. তেইপা-তান, ১৬. তা-কিয়ান, ১৭. টেঙঠাডো, ১৮. ছাউঙ-দ্বিন, ১৯. পৌংজি-তান, ২০. ছী-ড-তান, (জয়ঢাকের বাদ্য সহিত গান) ২১. হ্লে-ড' তান, ২২. লৌন-ছ্যিন, ২৩. ঠোন-জ্যিন, ২৪. লেঃ জ্যো জীঃ, ২৫. হ্ম্রা-টান, ২৬. বেইবঅঃ হ্লোয়েজিন, ২৭. হান্ ছ্যিন্, ২৮. সি-হে-পো, ২৯. কাউঙটৌন তান, ৩০. তৌন্-ঠা-তান্, ৩১. ণ-বে-তান্, ৩২. তান্ ছান্, ৩৩. ঙ্গো ছ্যিন্, ৩৪. বো লেঃ, ৩৫. তকিয়ান বো-লেঃ, ৩৬. তান্ জ্যো লেঃ জ্যোঃ, ৩৭. লাই-তান্, ৩৮. চ-ওয়ে-ডেইন তান্, (সাধারণত ডেইন্-তান্ বলা হয়) ৩৯. কালা তান্, ৪০. ট অউ-পীয়্যজি তান্, ৪১. ইয়োডিয়া নান্ তেইন্, ৪২. খইয়া তান্ (যিওন্), ৪৩. শোয়ে এঃ তান্।

দুটি ঘুমপাড়ানি গান

(১)

খো কান্ লো পেঃ
খো ফিউ খো পিয়া নের্ব্কা
কান্ খে হ্লাতেঃ।
পায়রা ধরে দে
শ্বেত পায়রা আর নীল পায়রা ওই (ওড়ে)
তাদের ধরা বড়োই কঠিন হে॥
পায়রা ধরে দে।

(২)

লুগলে ইয়ে এই বা ছো
ঢ্যাউং ও পে হেঃ
কাই হ্লে বা লেঃ
শোয়ে হ্মাই কিউ
পিনিয়া সী রে
মোয়ে ও খাল দি হ্মা সীরে
কাই হ্লে, বা লেঃ
ঢাউংজি ইয়ে মি টান্ টো
আছি-পো দ্বাঃ বা লো
আতাঃ গো হ্লি ও
কাই হ্লে বা গো

ঘুমাও জাদুমণি
বুড়ো বিড়াল ঝিমোচ্ছে বসে
কামড়াও এসে খোকাকে।
ওহে পণ্ডিত চটক পাখি
আছে ছোটো কুকুরটি
কামড়াও এসে খোকাকে।
লেজ-ছোটো ওই মস্ত বিড়াল
চর্বি গিলছে মাংসের
কামড়াও এসে খোকাকে।

রচনাকাল : ২৬ নভেম্বর ১৯৩৬

আবুল কালাম আজাদ : মনন ও ধর্ম

পুলকনারায়ণ ধর

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের একশ বছর পূর্ণ হল ১৯৮৮ সালের ১১ই নভেম্বর। তাঁর জন্মশতবর্ষ তাঁকে নতুন করে জানবার আর ভাববার সুযোগ আমাদের কাছে উপস্থিত করল। স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন প্রথম শ্রেণীর কাণ্ডারী এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহরুর সমকক্ষ বা তাঁর চেয়ে বড়ো একজন পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা ভারতীয়রা মৌলানা আজাদকে তেমন যত্ন করে স্মরণ করি না। তাঁর রচিত "ইনডিয়া উইনস ফ্রীডম"-এর অপ্রকাশিত তিরিশটি পৃষ্ঠার রহস্যের জন্য কিঞ্চিৎ আলোড়ন উঠেছে। সেই আলোড়নের ঢেউ তাঁকে আমাদের কাছে আবার নতুন করে নিয়ে এসেছে।

একথা বলার কারণ, তাঁর মৃত্যুর তিরিশ বছর পরও তাঁর কোনো প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ কোনো ভারতীয় পণ্ডিত বা ঐতিহাসিক রচনা করেন নি। রাষ্ট্র বা কোনো প্রতিষ্ঠানও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন নি। এ শুধু আমাদের লজ্জা নয়, এ আমাদের ঋণস্বীকারের দীনতাও বটে।

উর্দু আর আরব ভাষায় রচিত তাঁর বিপুল সাহিত্য-সম্ভার যদি ভাষান্তরিত হয়ে আমাদের কাছে পৌছত, তবে আমরা আবিষ্কার করতাম অন্য এক মৌলানা আজাদকে, যিনি শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়—সাহিত্য, কাব্য, দর্শন এবং জীবনের অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে তাঁর কীর্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন; তাঁর বোধের গভীরতা আর চিন্তার ব্যাপ্তি আমাদের চমকিত করত। ভারতীয় রাজনীতির অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে তাঁর প্রতিভা এবং দেশপ্রেমের আলোয় ম্লান বলেই মনে হবে। হয়তো এই কারণেই মৌলানা আজাদকে দুঃখজনক নীরবতার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে।

বিদেশী পণ্ডিত আয়ান হেনডারসন ডগলাস আবুল কালাম আজাদের জীবনীগ্রন্থটি উপহার দিয়ে আমাদের বিরাট অভাব দূর করেছেন। প্রায় পঁচিশ বছর ভারত আর পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ-ভাবে বাস করেছেন ডগলাস। সমকালীন ইসলাম আর তার সমস্যাকে তিনি বোঝবার চেষ্টা করেছেন এই উপমহাদেশের রাজনীতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। আবুল কালাম আজাদের জীবনের আর চিন্তার নানা ঘাতপ্রতিঘাত এবং অগ্রগতির তরঙ্গের মধ্যে তিনি আধুনিক ভারতীয় ঐসলামিক সমস্যাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

ডগলাসের গ্রন্থটি একটি উচ্চতর গবেষণার ফল। ১৯৬৯ সালে লেখক "দ্য লাইফ অ্যানড রিলিজিয়স থট অব আবুল কালাম আজাদ" নামে অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণাপত্র জমা দেন। ১৯৭৫ সালে মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর গেইল মিনঅলট এবং খ্রীস্টিয়ান ট্রল-এর সুদক্ষ, সুচারু সম্পাদনায় গবেষণাপত্রটি "আবুল কালাম আজাদ—অ্যান ইনটেলেকচুয়াল অ্যানড রিলিজিয়স বায়োগ্রাফি" নামে গ্রন্থাকারে রূপান্তরিত হয়ে ১৯৮৮ সালে আমাদের হাতে পৌছয়।

ভারতীয় ধর্মীয় সমস্যার বিশ্লেষণে ট্রল (Troll) একজন নামজাদা পণ্ডিত। তেমনি ভারতীয় রাজনীতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে "খিলাফৎ আন্দোলন" খ্যাত মিন্অলট একজন পরিচিত ঐতিহাসিক। ডগলাসের অনুপস্থিতিতে তাঁর গ্রন্থ সম্পাদনার বিরাট দায়িত্ব এই দুজন বিশেষজ্ঞ পালন করতে গিয়ে প্রথম গবেষণাপত্রটির ভূমিকা সম্পূর্ণ নতুনভাবে লিখেছেন। ভারতীয় মুসলমান আর আধুনিক ইসলাম সম্পর্কে যে-সমস্ত গ্রন্থ অধুনা প্রকাশিত হয়েছে এবং যা ডগলাস দেখে যাবার সুযোগ পান নি, মিন্অলট আর ট্রল সেই-সমস্ত গ্রন্থ আর দলিল বিশ্লেষণ করে ডগলাসের গ্রন্থটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

ভূমিকা এবং সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত ছাড়াও গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ে ডগলাস আজাদের জীবনের ১৮৮৮ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই

Abul Kalam Azad: An Intellectual and Religious Biography—Ian Henderson Douglas. Ed. Gail Minault, Christian W. Troll. Oxford University Press, 1988. Rs. 190.

পর্বে আজাদের বংশ এবং পারিবারিক পরিমণ্ডলের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আজাদের মানসিক গঠনের নির্মাণপ্রক্রিয়া এতে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১৯১০-১৯২২) আজাদের রাজনীতিক রূপান্তরের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে কোরান এবং ইসলামের ব্যাখ্যাপর্ব। এই অধ্যায়ে আজাদের বিশ্বাসের পুনর্জন্ম এবং রাজনীতিক পরিসমাপ্তিপর্ব আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক আজাদের সমগ্র জীবনের সংগ্রাম এবং তাৎপর্য অন্বেষণ করার এবং 'মানুষ' আজাদকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।

১৮৮৮ সালের নভেম্বরে মক্কায় এক গোঁড়া মুসলিম পরিবারে জন্ম হয় মহিউদ্দিন আহমেদ-এর। পিতা খৈরুদ্দিন দিহলাই পুত্রকে শুরু পীরের সাবেকি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের এবং ইংরেজি শিক্ষার সমস্ত দরজা-জানালা রুদ্ধ করে তিনি প্রায় গৃহবন্দী পুত্রকে গোঁড়া ঐসলামিক শিক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন। পিতা-পুত্রের সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ঐসলামিক আদর্শে। পরিবারের একনায়কতান্ত্রিক নেতা হিসাবে ও পীর হিসেবে খৈরুদ্দিনকে তাঁর পুত্রকন্যারা সম্বোধন করতেন 'হুজরত' (ইয়োর অনর) বলে। মাত্র ১১ বছর বয়সে মাতৃহারা মহিউদ্দিন তাঁর পিতার কঠিন শাসনের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তিনি লিখছেন, 'My late father's awesomeness overshadowed his affection. We were mentally so overawed that his very voice made us tremble.' মাতৃহীন পরিবারে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াল গুরুশিষ্যের সম্পর্ক। একদিকে কঠোর ঐসলামিক শিক্ষা এবং আরেকদিকে পিতৃতান্ত্রিক নিয়মের হৃদয়হীন শৃঙ্খলা পুত্র মহিউদ্দিনকে ভেতরে-ভেতরে করে তুলল অস্থির, বিদ্রোহী।

যে-সমস্ত পুস্তক আর বিষয় খৈরুদ্দিন মনে করতেন ইসলামবিরোধী, তার প্রতি পুত্রের ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ। গভীর রাত্রে বন্ধ ঘরে লুকিয়ে-লুকিয়ে মহিউদ্দিন সে-সমস্ত 'নিষিদ্ধ' পুস্তক অধ্যয়ন করতেন। পিতার সদাজাগ্রত চক্ষু যখন মূর্তিত, তখন জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবাধ পুত্রের চলত গোপন অভিসার। এমনিভাবেই একটু-একটু করে পিতার অগোচরে বাইরের জানালা দিয়ে খোলা আকাশকে তিনি দেখেছেন। পিতার শিক্ষা আর ঐসলামিক আদর্শ এবং নতুন জগৎ আর মুক্ত শিক্ষার দ্বন্দ্বে তাঁর মনে সৃষ্টি হল গভীর সংঘাত।

অষ্টাদশ শতকের সংস্কারক ও চিন্তাবিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ ও তাঁর পরবর্তী আবদুল হক দিহলাইর চিন্তাভাবনা এবং 'তখ্‌লিদে'র (Taqlid) বিরোধিতা খৈরুদ্দিনকে বিচলিত করলেও পুত্র মহিউদ্দিনকে দিয়েছিল অনাস্বাদিত জগতের সন্ধান। 'ওয়াহাবি' আন্দোলনও তাঁকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল। সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে পিতৃতান্ত্রিক নিয়মশৃঙ্খলা এবং চিন্তার জগৎ থেকে তিনি মানসিকভাবে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন। নতুন নাম গ্রহণ করে মহিউদ্দিন পরিণত হলেন আবুল কালাম আজাদে। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

আজাদের জীবনে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। তাঁরই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজাদ ইংরেজি আর বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা শুরু করেন। সৈয়দের প্রভাবেই আজাদ তাঁর পারিবারিক ধর্মীয় বন্ধন এবং মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। আরবি ভাষায় প্রকাশিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বই পড়ে তিনি এক নতুন ধর্মীয় বোধে উদ্বুদ্ধ হলেন। সংশয়ের দোলায় দুলতে-দুলতে শেষ পর্যন্ত তিনি এসে পৌঁছলেন তাঁর নিজস্ব যুক্তিবাদের জগতে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে যুক্তিবাদকে আজাদ গ্রহণ করতে পারেন নি। বিপুল বিষচরাচরে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস, চিন্তা আর যুক্তি নিয়ে তিনি অনুভব করতেন গভীর একাকিত্ব। শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকেই অবলম্বন করে তিনি বাঁচতে চাইলেন। ইসলামি কাঠামোতেই নতুন সমন্বয়ী ধর্মের সন্ধান করতে লাগলেন। এই পর্বে আজাদের আত্মিক দ্বন্দ্বের তীব্রতা আর ভয়ংকর একাকিত্ববোধ নিপুণ শিল্পীর মতন এঁকেছেন ডগলাস।

আজাদের মানসিক দ্বন্দ্বের পর্বে মৌলানা শিবলির (Shibli) সাহচর্য আর নেতৃত্ব তাঁকে বিপুলভাবে সাহায্য করেছিল। তাঁর জীবনে শিবলির প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য। ডগলাস অবশ্য এই ধারণাকে সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেন নি। যদিও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আর সাহিত্যিক সাহচর্যকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। ডগলাস আজাদের রাজনীতি ও ধর্মীয় চিন্তাভাবনাতে শিবলির প্রভাবকে খুব বড়ো বলে মেনে নেবার পক্ষে তেমন কারণ দেখেন নি। ডগলাস মনে করেন, একবার তাঁর পিতার ও আরেকবার স্যার সৈয়দের 'তখলিদ' থেকে মুক্ত হয়ে অন্য কারো বন্ধনে আবার আজাদ বাঁধা পড়তে পারেন না। কিন্তু আজাদ তাঁর লেখায় শিবলির

জীবনচর্যার যে শ্রদ্ধাশীল বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় আজাদের জীবনের অন্তঃস্থলে কোথাও না কোথাও শিবলির প্রভাব ছিল অমোঘ, যদিও আজাদ নিজে মৌলানা নামের অধিকারী হয়েও প্রাত্যহিক মুসলমান ছিলেন না।

ঈশ্বরের প্রতি আজাদের আস্থা ছিল অবিচল। গান্ধীর মতন তিনিও মনে করতেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁকে অনেক মহৎ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। ঈশ্বরনির্দেশিত হয়েই আজাদ ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক ধর্মচেতনায় এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিখ্যাত "আল হিলালে"র ও "আল্ বালাগে"র সম্পাদনা-কালে আজাদ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মুসলমান সমাজে "আল হিলাল" বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। আজাদ চেয়েছিলেন ভারতের মুসলমান সমাজকে গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে। মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকাকে তিনি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজের 'ঐমাম্' হতে। "হিস্‌বুল্লা"র (পার্টি অব গড) প্রধান হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন।

অবশ্য এই চিন্তাভাবনার পরিবর্তন হয়েছিল ১৯২৩ সালে জেল থেকে মুক্তিলাভের পর। 'খিলাফৎ' আন্দোলনের ঢেউ থেমে যাবার পর 'মুসলিম পুনর্জাগরণে'র পরিবর্তে 'হিন্দু-মুসলিম' ঐক্যের মূলভাবনার স্রোতে আজাদের চিন্তা প্রবাহিত হল। ডগলাস আজাদের চিন্তাভাবনার এই পরিবর্তনকেও তাঁর মূল ধর্মীয় চেতনা বা বোধ থেকে পৃথক করেন নি। ধর্মসমন্বয় ও হিন্দু-মুসলিমচিন্তা আজাদের আদি ধর্মচিন্তা ও বৌদ্ধিক অবস্থানেরই প্রসারিত অংশ বলেই তিনি মনে করেন। আমরা জানি যে, আজাদের চিন্তা ও বক্তব্য অনেক সময়ই স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত। ডগলাস এই অবস্থাকে ব্যাখ্যা করেছেন আজাদের মানসিক গঠনের প্রকৃতি বিচার করে। ডগলাসের মতে : 'Azad's mind was capable of making use of various elements in his intellectual store in accordance with the demands of the time.'

গান্ধাকে যেমন মূল ধর্মীয় চেতনা থেকে পৃথক করা যায় না, মৌলানা আজাদের ধর্মকেও তাঁর রাজনীতির জগৎ থেকে নির্বাসন দেওয়া যায় না। আজাদ ধর্ম এবং রাজনীতির বিচ্ছিন্নতাতেও বিশ্বাসী ছিলেন না। আজাদের ভাষায় : 'We have learned even our political thoughts from religion. They are not just coloured by religion. They are born of religion. How can we separate them from religion ?'

কোরানের আদর্শের ভিত্তিতেই মৌলানা আজাদ মুসলমানদের রাজনীতিক চেতনায় দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। আজাদের ধারণা ছিল, কোরানই মানুষকে সৎ জীবনের, মুক্তির পথ দেখাতে পারে। "আল-হিলালে"র প্রতি ছত্রেই তাই কোরানের আদর্শ প্রতিফলিত। আজাদ সমকালীন রাজনীতি এবং জীবনের সঙ্গে কোরানকে মেলাতে চেয়েছিলেন। সাধারণ মুসলমানদের কাছে কোরানের বাণীর সহজ ব্যাখ্যা পৌঁছে দেবার জন্য আজাদ রচনা করেছিলেন তরজুমান আল্ কোরান (Tarjuman al Quran)। হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাকে আজাদ ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েই বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে কোরান সম্বন্ধীয় কাজ সম্পূর্ণ করার তাগিদ অনুভব করেন নি।

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসাধনের চিন্তায় আর কাজে আজাদ ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। বৃহৎ মুসলমান সমাজের কাছে আজাদ ক্রমশই হয়ে উঠছিলেন ব্যাখ্যাতীত। তাদের কাছ থেকে তিনি ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলেন। মুসলমান সমাজের ঐমামপদের জন্য আজাদ এক সময় নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি হতে চেয়েছিলেন মুসলমান সমাজের নেতা। পরবর্তী কালে রাজনীতিক ঘটনাস্রোত তাঁকে ভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয় নেতার আসনে অধিষ্ঠিত করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতার পরিবর্তে সর্বভারতীয় কংগ্রেসি নেতায় নিজেকে রূপান্তরিত করলেন আজাদ। এই রূপান্তর বা উত্তরণ সাধারণ মুসলিমরা উদারভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁকে তাই নিন্দিত হতে হয়েছিল হিন্দুর চর বা মুসলমানদের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে (Mercenary agent of the Hindus, dishonest traitor to Islam)। মুসলমানদের ওপর আজাদের প্রভাব স্বভাবতই হ্রাস পেল, বিশেষত ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের পরে মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তানের দাবিদারেরা কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বেশি আক্রমণ শানিত করে আজাদের বিরুদ্ধে। অথচ মুসলমান সমাজকে ও ইসলামকে তিনি কখনোই পরিত্যাগ করেন নি। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন মুসলমান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ভাবিত।

আজাদের চিন্তাভাবনার বিভিন্ন উত্তরণপর্বে যে স-

বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয় ডগলাস তা নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু মুসলমান সমাজ থেকে তাঁর ক্রমনির্বাসনের ফলে আজাদের মানসিক দ্বন্দ্ব তথা প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ডগলাস বিশেষ আলোকপাত করেন নি। লেখক মূলত আজাদের জীবনের ধর্মীয় এবং বৌদ্ধিক বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। রাজনীতিক আজাদের চেয়ে মানুষ আজাদকেই তিনি বেশি করে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। আজাদের গভীর ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনা তাঁকে তাঁর সমকালীন রাজনীতিবিদদের তুলনায় বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র করে তুলেছে। ডগলাসের গ্রন্থটিতে আজাদের এই পরিচয়ই বিধৃত আছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবনীকার আজাদের 'egotism' বা অহংবোধের প্রশ্ন তুলে অবিচারও করেছেন বলে মনে হয়। যেমন, কারাবাসকালে তাঁর মুমূর্ষু স্ত্রীকে ইংরেজ সরকার দর্শন করার অনুমতি দিলেও ইংরেজের সেই বদান্যতা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমন-কী তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও তিনি ইংরেজের অনুমতিক্রমে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগদান করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন। ডগলাসের ধারণা, আজাদ তাঁর সুকঠিন ব্যক্তিত্বের একটা 'ইমেজ' রক্ষা করার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে আজাদের স্ত্রীর নামে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব আজাদ নাকচ করে দিয়েছিলেন এই যুক্তিতে যে তাঁর স্ত্রী রাজনীতি বা দেশের কোনো কাজেই নিজের জীবন উৎসর্গ করেন নি। এ সমস্তই ডগলাস আজাদের 'ইমেজ' রক্ষাকল্পে সুচিন্তিত পদক্ষেপ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সততার প্রশ্ন এখানে গৌণ হয়ে গেছে। এখানে ডগলাসের ব্যাখ্যা শুধু ভ্রান্তই নয়, নির্দয়ও বটে।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও আজাদ তাঁর সমকক্ষ বা অন্য কোনো উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করতেন। দেশের সংকটময় মুহূর্তে ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের সভাপতির পদে তাঁর পরিবর্তে নেহরুকে মনোনীত করা হয়। আজাদ কি তা সহজভাবে মন থেকে মেনে নিয়েছিলেন? ডগলাস এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানান নি। ১৯৪৬ সালে নেহরুর হাতে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ছেড়ে দিয়ে আজাদ ভুল করেছিলেন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। আজাদ নিজেও তা পরবর্তী কালে মনে করেছেন। কিন্তু, সৎ এবং সাহসী হলেও, আজাদ খুব শক্ত চরিত্রের মানুষ ছিলেন বলে ওয়াভেল বা মসলের মতন ব্যক্তিরা মনে করেন নি। ডগলাস অবশ্য আজাদের অহংবোধ বা egotismকেই তাঁর প্রধান শত্রু ও স্ববিরোধিতার উৎস বলে চিহ্নিত করেছেন।

দেশবিভাগ গান্ধী বা আজাদ কেউ ঠেকাতে পারেন নি। আজাদও গান্ধীর মতো ভগ্নহৃদয়ে দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিলেন। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের বিশেষ স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রয়োজনের কথা গান্ধীজীকে বোঝাতে। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি তেমন সাড়া পান নি। মুসলমানদের জন্য তাঁর এই চিন্তা হয়তো কোনো-কোনো ঐতিহাসিকের কাছে আজাদকে অন্যভাবে উপস্থিত করেছে। প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেস সভাপতি থাকার সময়ই তিনি মুসলিমদের প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন। ব্যর্থ হয়েছিলেন। সিমলা কনফারেনসও ব্যর্থ হল। এ-সমস্ত ঘটনা কংগ্রেসের ভেতরে হিন্দু রাজনীতিবিদ্‌রা কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা আমাদের খুব একটা অজানা নয়। কিন্তু আজাদের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তা জানার কৌতূহল ডগলাস নিবৃত্ত করেন নি।

দেশবিভাগের পরও আজাদের আশা ছিল যে, দেশভাগ হলেও হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক বন্ধন অটুট থাকবে। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে আজাদ হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। সরকারি নীতি এবং আমলাতন্ত্র তাঁর পথে বাধা হয়েছিল। সমস্ত বিষয়েই তাঁর শেষ পর্যন্ত মোহভঙ্গ হয়েছিল। এক ভগ্নহৃদয় ও নিঃসঙ্গ মানুষ অপরিমিত মদ্যপানে নিজেকে একটু-একটু করে নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন। ডগলাসের বর্ণনা এ পর্বে সুন্দর।

"ইনডিয়া উইনস ফ্রীডম" গ্রন্থে আমরা আজাদের যে-পরিচয় পাই, ডগলাস সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নন। হয়তো আমরা অনেকেই নই। আজাদ এই বইটি ছাড়াও আরও দুটি আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন। প্রথমটি "তাজ্‌কিরা"। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অন্তরীণ থাকার সময় উর্দুতে তিনি এটি রচনা করেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে তিনি এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দ্বিতীয়টিতে আবদুল রজ্জাক মালিহাবাদী নামে তাঁর এক শিষ্যকে ১৯২০ সালে জেলখানায় তিনি মুখে-মুখে নিজের কথা বলে গিয়েছিলেন। "আজাদ্ কি কহানি খুদ্ আজাদ্ কি জবানি"—এই দুটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের সঙ্গে ইংরেজি বইটিকে মিলিয়ে নিতে হবে। ডগলাসের ধারণা, "ইনডিয়া উইনস ফ্রীডম" গ্রন্থের

অপ্রকাশিত ত্রিশ পৃষ্ঠায় হয়তো আজাদ তাঁর পিতৃপুরুষদের সম্বন্ধে এমন কিছু লিখেছেন যা এযাবৎকাল তাঁর সম্বন্ধে আমরা যা জেনে এসেছি তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

কিন্তু কেন? জীবনীকারের যুক্তি অনুসরণ করলে আজাদকে একজন উচ্চাভিলাষী ও অহংকারী মানুষ বলে মনে হয়। ধমনীতে তাঁর আরবি রক্ত প্রবাহিত। মুঘল দরবারে আকবর বাদশার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করার মতন সাহস তাঁর পূর্বপুরুষ দেখিয়েছিলেন। এ সমস্তই খুব বড়ো করে দেখাবার প্রয়োজন হয়তো আজাদের হয়েছিল ভারতীয় মুসলিমদের "ইনাম" হবার অভিলাষ থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে পাকাপোক্ত অভিজাত আসন দখল করবার প্রয়োজনে। আজীবন তিনি তাঁর 'ইমেজ' নিয়ে ভাবিত ছিলেন। এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ কথা বলবে।

এই গ্রন্থ রচনাকালে আজাদকে লেখকের তত বড়ো বলে মনে হয় নি, যত বড়ো মনে হয়েছিল আজাদের কিংবদন্তী। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হুসেনকে আজাদ সম্পর্কে লেখক তাঁর উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করলে রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, 'Go on with your study. Speak the truth but be charitable.'

'মানুষ' আজাদকে তিনি তাঁর সমস্ত দোষ-গুণ নিয়েই খুব স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত করেছেন। সংশয় আর কঠিন সমালোচনা থাকলেও কোনো অশ্রদ্ধা তাঁর লেখায় প্রকাশ পায় নি। এই উপমহাদেশে বিরাট হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্যের জন্য সংগ্রাম ক'রে যে-মানুষটি শেষ জীবনে সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে ডগলাসের শেষ কথা: 'He was a sadly misunderstood man' এবং 'His life may yet hold lessons for his nation.'

ডগলাস আবুল কালাম আজাদকে কোথাও 'মৌলানা' বলে উল্লেখ করেন নি। হয়তো তাঁর ধারণা, আবুল কালাম আজাদ সত্যিকারের বা প্রচলিত অর্থে "মৌলানা" ছিলেন না। বস্তুতপক্ষে আজাদের ধর্মবোধ এবং ধর্মীয় বৌদ্ধিক বিবর্তনের ইতিহাসই ডগলাস আলোচনা করেছেন। রাজনীতি ডগলাসের মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে নি। আজাদের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁর ধর্ম এবং চিন্তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে। ডগলাসের কাছে আজাদের জীবনের মূল প্রাঙ্গণে রাজনীতি গৌণপুত্রের স্থান পেয়েছে। তাই এই গ্রন্থটিকে আজাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলে মনে করা যায় না। ইতিহাসগ্রন্থ তো নয়ই। কিন্তু আজাদের রাজনীতিক জীবনী রচনার ক্ষেত্রে ডগলাসের গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য। আজাদের জীবনের মূল ভিত্তিটাকে তিনি ধরবার চেষ্টা করেছেন। মানুষ আজাদকে না জানলে রাজনীতিক আজাদও আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবেন। এই বিচারে ডগলাসের গ্রন্থটির অপরিহার্যতা যে-কোনো পাঠকের বা গবেষকের কাছে নিঃসন্দেহে অনুভূত হবে।

পরিশেষে, যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামের আর-এক বিরাট মুসলিম নেতা খান আবদুল গফফর খানের সঙ্গে আজাদের একটি চিত্র বইটিতে স্থান পেয়েছে, আবদুল গফফরের সঙ্গে আজাদের কোনো সম্পর্ক বা চিন্তাভাবনার সাযুজ্য নিয়ে লেখক একটি কথাও বলেন নি। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ডগলাস দেন নি।

জিন্নাহ্ চর্চা : নয়া ভাবনা

খালিম আহ্‌মেদ

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ বিতর্কিত নাম। সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসে জিন্নাহ্‌র মতো বহুনিন্দিত আর একজনই আছেন—তিনি আওরঙ্গজেব। পাকিস্তানে জিন্নাহ্ 'কায়েদ-ই-আজম' রূপে বন্দিত। ভারতবাসী তাঁকে এই শতাব্দীতে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবলতম প্রবক্তা আর ভারতবিভাজনের কারণ মনে করেন। রাষ্ট্রানুকোচিত গুণের অধিকারী জিন্নাহ্, এই দেশের ইতিহাসের গতিপথ পালটে দিয়েছিলেন। সৃষ্টি করেছিলেন একটি রাষ্ট্রের। জাতীয়তাবাদের মূল স্রোত থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তিনি ইতিহাসনির্মাতা।

অথচ জিন্নাহ্, রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন (১৮৯৬) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির একজন দেশপ্রেমিক বিশিষ্ট নেতা হিসেবে। উচ্চশিক্ষিত উদারমতাবলম্বী সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মানুষ। মুসলিম নেতা হিসেবে তিনি কখনো পরিচিত ছিলেন না। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকালে আদর্শগত কারণে তাতে যোগ দেন নি। এক সময়ে মুসলিম লীগ তাঁকে দলে টানায় চেষ্টা করেছেন।

জিন্না : পাকিস্তান—নতুন ভাবনা—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩। পঞ্চাশ টাকা।

জিন্নাহ্ অবজ্ঞায় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন, তিনি কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা নন—তিনি সর্বভারতীয় নেতা। সরোজিনী নাইডু তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করার সময় গোখলের বিখ্যাত উক্তির পুনরুক্তি দেন—'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজদূত'। জীবনের শেষ পর্যায়ে সেই মানুষের রূপান্তর বিস্ময়কর। কিন্তু জিন্নাহ্ কেন মুসলিম লীগের সর্বময় কর্তা হয়ে পাকিস্তানের প্রবক্তা হয়ে উঠলেন? মাত্র সাত বৎসরের কুশলী রাজনীতিক পদক্ষেপ আর ধৈর্যের দ্ব রা তিনি একেবারে শব্দার্থে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের গোঁড়ামিমুক্ত জিন্নাহ্ কি সত্য-সত্যই ভারতভাগ করে পাকিস্তান চেয়েছিলেন? সেই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়ক জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক জীবনের বিবর্তনের ধারাবাহিক অনুপুঙ্খ বিবরণ আর তথ্যসমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পেশ করেছেন শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশবিভাগের চল্লিশ বছর বাদে জিন্নাহ্ সম্বন্ধে সহৃদয় ভাবে বিচার করার ভার নিয়েছেন শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি স্বয়ং একজন গান্ধীবাদী। একজন গান্ধীপন্থীর পক্ষে নির্মোহ মূল্যায়ন সহজ বিষয় নয়।

তিনি কেন এম. এ. জিন্নাহ্‌র সম্বন্ধে আলোচনা করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, তার কৈফিয়ত দিয়েছেন। দেশবিভাজনের প্রাক্কালে তাঁর মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, জিন্নাহ্ 'আত্যন্ত সাম্প্রদায়িক', 'দেশদ্রোহী' এবং 'খলনায়ক' (পৃ ১)। কিন্তু তাঁর 'মনের বদ্ধ' অর্গলে প্রথম আঘাত পড়ল 'পঞ্চাশের দশকে।' (পৃ ২) পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যদের সামনে প্রদত্ত জিন্নাহ্‌র প্রথম বক্তৃতার (১১ অগস্ট, ১৯৪৭) অংশ-বিশেষ, একটি প্রবন্ধে পড়ার পর, তিনি যেন জিন্নাহ্‌কে নতুন করে আবিষ্কার করেন। জিন্নাহ্ এই বক্তৃতাটিতে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে হিন্দু মুসলমান—এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায় একদিন তাদের নিছক ধর্মীয় পরিচয় থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হবে। (বক্তৃতার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি, পৃ ২)। গ্রন্থকার দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছন, এ তো কোনো সাম্প্রদায়িকতাবাদীর উক্তি হতে পারে না। অতঃপর ১৯৬৯ সালে "দ্য স্টেটসম্যান" পত্রিকায় প্রবীণ সাংবাদিক বি. শিবরাও-এর একটি প্রবন্ধ পড়ার পর থেকেই 'জিন্নাহ্ সম্বন্ধে অধ্যয়ন আমার প্রায় একটা বাতিকে পরিণত হয়' (পৃ ৭)। তার ফল হল, ৩০৩ পাতার এই বিশাল গ্রন্থটি।

জিন্নাহ্‌র ধারাবাহিক জীবনী অবলম্বন করে গ্রন্থকার প্রথমে অগ্রসর হয়েছেন।

১৮৯২-এর ৩০শে জানুয়ারি (কোনো-কোনো গবেষকের মতে ১৮৯৩) ইংল্যান্ডের পথে রওনা হন জিন্নাহ্ এবং ১৮৯৫ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। বিলেতে থাকার সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-ভবনে দর্শকের আসনে মুগ্ধচিত্তে আইরিশ হোমরুল এবং নারীমুক্তি সম্বন্ধে দাদাভাই নৌরজীর (তিনি তখন পার্লামেন্টের সদস্য) বক্তৃতা শুনছেন। 'গ্রান্ড ওল্ড-ম্যান' দাদাভাইকে মনে-মনে গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছেন। ইচ্ছা ভারতে গিয়ে তিনি গুরুর মতোই লিবারাল এবং সংবিধান অনুসারী পার্লামেন্টারিয়ান হবেন। (পৃ ৯)।

১৯০০ থেকে তিনি পুরোপুরি রাজনীতিতে মন দিলেন। ১৯০৫ সালে মে মাসে অসুস্থ স্যার ফিরোজশাহ মেটার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে তিনি গোখলের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য ভারতের স্বায়ত্তশাসনের জন্য সেখানে জনমত সৃষ্টি করা। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত হলেন ত্রিশ বৎসরের যুবক জিন্নাহ্। তিনি তখন পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আগ্রহী। ওই বছরেই প্রতিষ্ঠিত নিখিল-ভারত মুসলিম লীগে তিনি যোগ দেন নি। আগা খাঁ মন্তব্য করেছিলেন যে জিন্নাহ্ ১৯০৬ সালে তাঁদের কঠোরতম বিরোধী ছিলেন। জিন্নাহ্ বলেছিলেন যে পৃথক নির্বাচন-নীতি জাতিকে খণ্ড বিখণ্ড করবে (পৃ ১০)। ১৯০৭ এ জিন্নাহ্ সুরাট কংগ্রেসে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কংগ্রেসের প্রথম ভাঙন। অতঃপর বোম্বাই হাইকোর্টে তিলকের কারামুক্তির দাবি করেন। ১৯১০-এ বড়োলাটের কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। এই বছরেই এলাহাবাদের ২৫তম কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনব্যবস্থার নিন্দা করে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ওই সময়ে এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে বুকের পাটার দরকার ছিল (পৃ ১৮)। ১৯১১-তে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১০ থেকে শুরু করে ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদের সদস্য ছিলেন। গোখলে-উত্থিত নানা বিল আর প্রস্তাবের সমর্থন করে বক্তৃতা দিয়েছেন জিন্নাহ্। তাঁর ইচ্ছে ছিল গোখলের পদচিহ্ন অনুসরণ করা (পৃ ১৮)। সুরেন ব্যানার্জিকে নেতা হিসাবে স্বীকার করেছিলেন। ১৯১৩-তে মুসলিম লীগের তদানীন্তন সম্পাদক সৈয়দ ওয়াজির হাসানকে জিন্নাহ্ এক পত্রে লেখেন যে, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ছাত্ররা যাতে পরস্পরের সঙ্গে অধিক মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয় তার জন্য একই স্কুলে উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রদের স্থান দিতে হবে (পৃ ১৯)।

মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র মুসলিম লীগে যোগদান প্রসঙ্গে শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, কংগ্রেস এবং লীগকে কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য ১০ অকটোবর ১৯১৩ সালে তিনি বিধিবদ্ধভাবে মুসলিম লীগের সভ্য হয়েছিলেন। গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে সরোজিনী নাইডুর একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'নিজের উদাহরণ দ্বারা জিন্নাহ্ যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রসারিত করার জন্য ইতিমধ্যে এত করেছিলেন, অবশেষে তাতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলেন। ...তাঁর নাম সুপারিশকারী দুইজনকে এই মর্মে আগাম পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে, তাঁর মুসলিম লীগ ও মুসলিম স্বার্থের প্রতি আনুগত্য কোনো ক্রমেই বা কোনো সময়েই, যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের সাধনে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত, তার পথে বিন্দুমাত্র বাধক হতে পারবে না' (পৃ ২০)। গ্রন্থকার মন্তব্য করছেন, 'জাতীয়তাবাদী মানসিকতার কোন উচ্চস্তরে জিন্নাহ্ উঠেছিলেন, তার নিদর্শন পাওয়া যায় এই উদ্ধৃতিতে। এই প্রসঙ্গে নেহরুর মন্তব্যটিও স্মরণযোগ্য। তিনি জিন্নাহ্ সম্পর্কে লিখেছেন, 'অতীতে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের কাছাকাছি আনার কৃতিত্ব ছিল তাঁরই।' (An Autobiography, পৃ ৬৭)। মুসলিম লীগের সভাপদ গ্রহণ করলেও কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দৃঢ় সম্পর্ক বজায় ছিল। এর পরেও তিনি মাদ্রাজ অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৫-র নভেমবরে মুসলিম নেতা এবং জনসাধারণের কাছে এই আবেদন রাখলেন, তাঁরা যেন 'হিন্দু বন্ধুদের' সঙ্গে একসঙ্গে চলার উদ্দেশ্যে এবং এক সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ার জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হন (পৃ ২২)। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য জিন্নাহর ঐকান্তিক চেষ্টা আর নিরন্তর প্রয়াসের অজস্র তথ্য পেশ করেছেন লেখক।

১৯১৬ সালে লখনৌতে অনুষ্ঠিত হল প্রথমে কংগ্রেসের (২৫-২৮ ডিসেমবর) ও পরে (৩০-৩১ ডিসেমবর) লীগের ঐতিহাসিক অধিবেশন। এখানেই লীগ-কংগ্রেস তথা মুসলিম-হিন্দু ঐক্যের ফরমূলা লখনৌ চুক্তি অনুমোদিত হল। এই চুক্তিতে সই করেছিলেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বি. জি. তিলক এবং লীগের পক্ষ থেকে এম. এ. জিন্নাহ্। লখনৌ চুক্তির প্রস্তাব ছিল, 'বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী' দ্বারা মুসলিম সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। এই ব্যবস্থায় মুসলমান সংখ্যালঘুদের জন্য আসনবণ্টন হল নিম্ন হারে: 'পাঞ্জাবে নির্বাচিত সদস্যদের অর্ধেক, সংযুক্ত প্রদেশে শতকরা ৩০ ভাগ, বাংলায় শতকরা ৪০ ভাগ, বিহারে শতকরা ২৫ ভাগ, মধ্যপ্রদেশে শতকরা ১৫ ভাগ, মাদ্রাজে শতকরা ১৫ ভাগ এবং বোম্বাই প্রদেশে তিন ভাগের এক ভাগ। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের...নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ হবেন মুসলমান' (পৃ ২৪-২৫)। এই চুক্তিটি ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। লখনৌ চুক্তির পর জিন্নাহ্ ভারতীয় রাজনীতিতে প্রায় মহানায়কের স্থান দখল করেন। লখনৌতে লীগের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন, 'হিন্দুদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে শুভেচ্ছা এবং ভ্রাতৃভাবাপন্ন' (পৃ ২৫)।

১৯১৭-তে হোমরুল লীগে যোগ দিয়ে তিনি বোম্বাই শাখার সভাপতি হন এবং অ্যানি বেসান্তকে পাঠানো এক চিঠিতে লেখেন: 'মুসলমানদের প্রতি আমার নিবেদন হল এই যে, তাঁরা যেন তাঁদের হিন্দুভাইদের সাথে হাত মেলান। হিন্দুদের প্রতি আমার নিবেদন হল—আপনাদের অনগ্রসর ভাইদের উত্থানের সহায়ক হোন। এই আদর্শ নিয়েই যেন হোমরুল লীগের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং তাহলে আমাদের আর ভয়ের কারণ থাকবে না' (পৃ ২৭)। ওই বৎসরই কলকাতায় মুসলিম লীগের অধিবেশনে সহকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনাদের শত্রুদের প্ররোচনায় আতঙ্কিত হয়ে হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবেন না। কারণ স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্তির জন্য এই সহযোগিতা অপরিহার্য' (পৃ ২২)।

১৯১৯-২০ সালে গান্ধী যখন উদীয়মান নেতা তখন অ্যানি বেসান্তের পদত্যাগের পর এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা হিসেবে জিন্নাহ্ গান্ধীর নাম সভাপতি হিসেবে প্রস্তাব করেন। হোমরুল লীগের সভাপতি হবার পর গান্ধী এই প্রতিষ্ঠানের নাম বদলে রাখলেন 'স্বরাজ্য সভা' এবং এর মূল নীতিরও পরিবর্তন করলেন। এমন-কী, সংবিধানও পালটে দিলেন। সমস্ত রকমের আপত্তি অগ্রাহ্য করলেন গান্ধী। স্বভাবতই জিন্নাহ্ প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে পদত্যাগ

করেন। হোমরুল লীগ সংক্রান্ত এই পরিবর্তনকে জয়াকর, যমুনা দাস দ্বারকা দাস, মঙ্গল দাস পাকবাসা ও কানহাইয়ালাল মুন্সী প্রমুখ প্রবীণ নেতারাও সমর্থন করেন নি (পৃ ৩৯)।

রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ জিন্নাহ্ পছন্দ করতেন না। কিন্তু ১৯১৯ সালে রাওলাট আইন প্রবর্তিত হলে তার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। জিন্নাহ্ বলেন, 'বিচার বিভাগের ক্ষমতা প্রশাসকদের হাতে দিলে প্রচণ্ড রকমে ক্ষমতার অপব্যবহারের পথ প্রশস্ত হবে।' (পৃ ৩২)। দেশ জুড়ে জিন্নাহ্‌র জয়জয়কার। কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হয়ে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন, এমন সময়ে ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। মুহূর্তে রাজনৈতিক পটভূমির আমূল পরিবর্তন, গান্ধী নেতৃত্বের উদ্ভব। কংগ্রেসের নেতৃত্বে এসেই গান্ধী খিলাফত রক্ষার আন্দোলনকে সমর্থন করলেন। সংবিধাননিষ্ঠ এবং অসাম্প্রদায়িক জিন্নাহ্ খিলাফত নিয়ে আন্দোলন এবং অসহযোগের বিরোধিতা করেছেন। ১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (৪-৯ সেপ্টেমবর) অসহযোগের প্রস্তাব স্বীকৃত হলেও সেই প্রবাহে তিনি গা ভাসান নি। বিষয়-নির্বাচনী সভার তাবৎ মুসলমান সদস্যদের মধ্যে একমাত্র জিন্নাহ্‌ই ছিলেন খিলাফত আন্দোলনের বিরোধী। জিন্নাহ্‌র সংবিধাননিষ্ঠ চরিত্র এবং প্যান-ইসলামিক মানসিকতার প্রতি তাঁর দৃষ্টিকোণ বোঝার জন্য এই বিষয়টির গুরুত্ব আছে (পৃ ৩০ এবং ৩৫)। অ্যানি বেসান্ত, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, দেশবন্ধু এবং বিপিনচন্দ্র পাল জিন্নাহ্‌র সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন। পরে দেশবন্ধু গান্ধীর প্রভাব-বলয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

এর তিন মাস পরে (২৮ ডিসেমবর) নাগপুর কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। এই কংগ্রেস ভারতবর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক জীবনেও এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নাগপুর কংগ্রেসে জিন্নাহ্ সাহস করে এককভাবে অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলন-প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। সেই বিরোধিতা অনেক তীব্র, তীক্ষ্ণতায় কুলিশ-কঠোর। কলকাতা কংগ্রেসে জিন্নাহ্ গান্ধীকে 'মহাত্মা' অভিধায় সম্বোধন করেছিলেন, কিন্তু এবার তাঁকে কেবল 'মিঃ গান্ধী' বলে অভিহিত করলেন, মহম্মদ আলির নামের পূর্বে 'মৌলানা' যোগ করলেন না। 'মহাত্মা' এবং 'মৌলানা' ব্যবহারের জন্য প্রতিনিধিরা পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু জিন্নাহ্ অবিচল। সৌকত আলি জিন্নাহ্‌র প্রতি কটূক্তি করতে-করতে ঘুসি পাকিয়ে ছুটে গেলেন জিন্নাহ্‌র দিকে। অন্যেরা তাঁকে ধরে ফেললেন। জিন্নাহ্ প্রত্যক্ষত অপমানিত হলেন। কংগ্রেসের অসহিষ্ণু প্রতিনিধিদের অপমানজনক এবং অগণতান্ত্রিক আচরণে ক্ষুব্ধ দুঃখিত জিন্নাহ্ অধিবেশন বর্জন করে সেই রাতেই চলে গেলেন। প্রতিনিধিদের উপেক্ষাকে অগ্রাহ্য করে তাঁর বিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন—'আমার পথই যথার্থ—সাংবিধানিক পথই যথার্থ।' সঙ্গে-সঙ্গে জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক জীবনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবসান ঘটল (পৃ ৩৭)! ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে জিন্নাহ্ হয়ে পড়েন এক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব। গান্ধীর সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘাত, আদর্শগত মতভেদ, প্যান ইসলামবাদীদের প্রতি গান্ধীর পক্ষপাত, এমন-কী তাঁর ইংরিজি-কেতাদুরস্ত জীবনযাত্রার প্রতি গান্ধীর বিরূপতা, জিন্নাহ্‌কে বিরক্ত করে তুলেছিল। উপরন্তু 'পাক্কা সাহেব' জিন্নাহ্‌র যুক্তিবাদী মন গান্ধীর 'মিস্টিক' কার্যকলাপ আর কুসংস্কারকে সমর্থন করতে পারে নি (পৃ ৩৭) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১৫ সালের গুর্জর সভায় এবং ১৯১৮তে দিল্লীর "যুদ্ধ সম্মেলনে" গান্ধী এবং জিন্নাহ্‌র ব্যক্তিত্বের সংঘাত ঘটেছিল।

এ সত্ত্বেও জিন্নাহ্ যথার্থ অর্থে শিভলরাস ভদ্রলোক। ১৯২৪ সালে লীগের লাহোর অধিবেশনে গান্ধীর সঙ্গে তীব্র মতভেদ থাকলেও, গান্ধীকে 'মহাত্মা' বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, 'যেদিন হিন্দু ও মুসলমান মিলিত হবে, সেই দিনই ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসন পাবে' (পৃ ৪৪)। ১৯২৭-এ জিন্নাহ্‌র সভাপতিত্বে দিল্লী মুসলিম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হল। লখনৌ চুক্তির বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী'র স্থলে 'জয়েন্ট ইলেকটরেট' বা 'হিন্দু-মুসলমান সংযুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী' মেনে নিতে মুসলিম নেতৃবর্গ রাজি হলেন। এই সিদ্ধান্ত ঐক্যের পথে এক বিরাট পদক্ষেপ। এটি জিন্নাহ্‌র কৃতিত্ব। দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাবের বাকি বিষয়গুলো ছিল লখনৌ চুক্তির প্রায় অনুরূপ। এই প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯২৮-এ নেহরু কমিটির রিপোর্ট ঐক্যের আশাকে রুদ্ধ করে দেয়। (রিপোর্টের সুপারিশ ছিল খুবই বিতর্কমূলক—পৃ ৫১)। মুসলিম লীগ তীব্র প্রতিবাদ করে। ১৯২৮-এ সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে ২২শে ডিসেমবর জিন্নাহ্ কতকগুলো প্রস্তাব রাখলেন এবং এই মন্তব্য করলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রত্যক্ষ করার চেয়ে আর কিছু তাঁকে তেমন সুখী করতে পারবে না। গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনার পরও জিন্নাহ্‌র একটি প্রস্তাবও গৃহীত হল না। উপরন্তু কংগ্রেসি সদস্যদের একাংশ তাঁর সঙ্গে

সদ্ব্যবহার করেন নি। কী মানসিক চাপ ও উদ্বেগের মধ্যে জিন্নাহ্‌কে তাঁর ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে, তাও তাঁরা অনুধাবন করেন নি। আহত-হৃদয়ে জিন্নাহ্ সম্মেলন থেকে বিদায় নিলেন। ঘটনার পরের দিন, দিল্লী যাত্রার পূর্বে তাঁর জনৈক পার্শী বন্ধুকে সজল চক্ষে বলেছিলেন, 'জামশেদ, এবার আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল।' (শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, প্রকাশ্যে জিন্নাহ্‌র চোখে জল আসার যে বিরল ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, এ তার একটি (পৃ ৫৭))। ১৯২৯ সালে মুসলিম স্বার্থ রক্ষাকল্পে পেশ করলেন চোদ্দ-দফা দাবি। জিন্নাহ্ ফিরে গেলেন "সেপারেট ইলেকটরেট" বা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবিতে, একদা যে দাবিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন না দিলে কংগ্রেস 'পূর্ণ স্বাধীনতার' দাবি জানাবে—এই বিষয়টিকে জিন্নাহ্ "রাজনৈতিক হিস্টিরিয়া" আখ্যা দিয়ে গান্ধীর প্রতি তীব্র আক্রমণ করেন। মুসলমান সমাজের কাছে এই আন্দোলন ছিল 'হিন্দুদের সংগ্রাম' (পৃ ৬৯)। এমন-কী, কংগ্রেসের মহম্মদ আলি পর্যন্ত মন্তব্য করেন, 'শ্রীযুক্ত গান্ধী সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু মহাসভাপন্থীদের প্রভাবে কাজ করছেন। তিনি হিন্দুধর্মের প্রভুত্ব এবং মুসলমানদের আত্মসমর্পণের জন্য কাজ করেছেন' (পৃ ৬৯)। ১৯৩০-এর ৭ মার্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে জিন্নাহ্ বললেন, 'হিন্দুরা আমাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করুন বা নাই করুন, আমরা এগিয়ে যেতে চাই এবং আমরা এদেশে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য যথেষ্ট রক্ষাকবচ ব্যবস্থাযুক্ত দায়িত্বশীল সরকার চাই' (পৃ ৭০)। ক্রমেই সন্দেহ, অবিশ্বাস, আর দেশের কোথাও না কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হওয়াতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠল। ১৯৩০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনে সভাপতি ড. মহম্মদ ইকবাল এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে বা বাইরে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন (পৃ ৭৩)।

ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত, উদার, অসাম্প্রদায়িক জিন্নাহ্‌র ব্যাপক পরিচয় তুলে ধরেছেন আলোচ্য গ্রন্থের গান্ধীবাদী লেখক শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কিছু নজির এখানে উল্লেখ করা হল: ১৯২৫ সালে মাহমুদাবাদের রাজাকে বলেছিলেন, তিনি প্রথমে ভারতবাসী, পরে নিজেকে মুসলমান বিবেচনা করেন (পৃ ৪)। ১৯৩১ এ পর্যন্ত একই উক্তি করেন (পৃ ৬৪)। স্মর্তব্য, নাগপুর কংগ্রেসের পর তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। 'জিন্নাহ্ এই পরিমাণ ধর্মীয় গোঁড়ামিবর্জিত ছিলেন যে ১৯২৪ সালে একবার দিল্লীতে…তেজবাহাদুর সপ্রুকে…বলেছিলেন, '…আপনারা আপনাদের গোঁড়া পুরোহিতশ্রেণীকে উৎসাদন করুন এবং আমরাও আমাদের মোল্লাদের ধ্বংস করি—তাহলে সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে' (পৃ ৫)। (এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন, 'এমন-কী ১৯৪৬ সালেও কট্টর ইসলাম-অনুসারীদের কী পরিমাণ বিরোধী ছিলেন তাঁর বিবরণ এক সাম্প্রতিক গ্রন্থে [ড. আফজল ইকবাল ; Islamisation of Pakistan] পাওয়া গেছে।' বিষয়টি উলেমাসমাজ সংক্রান্ত, দেখুন পাদটীকা, অধ্যায় ১, নং ১২, পৃ ২)। তাঁর ব্যক্তিজীবনেও মুসলিম অভিজ্ঞানের প্রকাশ ব্যাপক লক্ষ করা যায় না। মানসিকতার দিক দিয়ে ছিলেন প্রায় ব্রিটিশ। হিন্দু-মুসলিম মতভেদকে সাম্প্রদায়িক নয়, জাতীয় সমস্যা হিসেবে ব্যাখ্যা করতেন তিনি (পৃ ৬৬)। গ্রন্থকার স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন, 'অন্ততঃ ত্রিশের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত তিনি যে জাতীয়তাবাদী ছিলেন একথা তাঁর সমালোচকের পক্ষেও অস্বীকার করা সম্ভব নয়।' তিনি আরও লিখেছেন যে বহু গান্ধীপন্থী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন জিন্নাহ্‌র বক্তৃতা শুনে। এই বক্তৃতাগুলো মাদ্রাজের নটেশন কোমপানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করে (পৃ ৪)। এমন একজন মানুষ ধর্মাভিত্তিক রাষ্ট্রের জনক হবেন—এ যেন ইতিহাসের এক পরম বিস্ময়জনক রহস্য।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জিন্নাহ্ এতই হতাশ হয়েছিলেন যে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্ত হবার পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন নি। হ্যাম্পস্টেডে একটি বাড়ি কিনে গুছিয়ে বসেছিলেন। ভগ্নী ফতিমা ও কন্যা দীনাকে সঙ্গে রেখেছিলেন। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে জিন্নাহ্ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করলেন। মাঝে-মাঝেই লনডনে ফিরে গেছেন। বোম্বেতে স্থায়ী হলেন। মুসলিম লীগের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে তার মাধ্যমে মুসলিম রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণের জন্য জিন্নাহ্‌র কাছে যেসব নেতা আগ্রহ প্রকাশ করতেন তার মধ্যে তাঁর গুণগ্রাহী এবং অনুগামী সস্ত্রীক লিয়াকৎ আলী খাঁ, আসামের আব্দুল মতিন চৌধুরী, খলিকুজ্জমাঁ প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশে ফিরে জিন্নাহ্ রাজনীতিতে প্রবলভাবে যোগ দিলেন। এর আগেই ১৯৩২ সালের ২রা মার্চ আব্দুল মতিন চৌধুরীকে

এক গোপনীয় ও ব্যক্তিগত পত্রে লিখেছিলেন, 'মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। ...হাতের তাস কিভাবে খেলতে হয় তা যদি মুসলমান নেতারা জানেন তাহলে নিঃসন্দেহে সম্প্রদায় যা চান তা পাবেন।' অন্য একটি পত্রে, ১৯৩২-এর ১লা ডিসেমবর আব্দুল মতিন চৌধুরীকে লেখেন, 'জনসাধারণই যখন বিভক্ত তখন আর কি আশা করা যেতে পারে? এ ভারতবর্ষের বিধিলিপি' (পৃ ৭৯)। 'হিন্দু নেতৃত্বের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে জিন্নাহ্ ক্রমশঃ নিছক মুসলমান নেতায় পর্যবসিত হচ্ছেন' (পৃ ৭৯)। কংগ্রেস ও গান্ধীর কঠোর সমালোচনা করছেন। ১৯৩৩ এর ৩০শে মার্চ জনাব মতিনকে লেখেন, 'হিন্দুরা সঠিক অবস্থা উপলব্ধি না করা পর্যন্ত ভারতবর্ষকে বাঁচাবার জন্য কিছু করার উপায় নেই' (পৃ ঐ)। এরই মধ্যে ১৯৩৫-এ নিজের বিশ্বাসের পুনরুক্তি করে বলেছিলেন, 'হিন্দু ও মুসলমানরা যত দিন না ঐক্যবদ্ধ হয় ততদিন ভারতবর্ষের আশার কিছু নেই' (পৃ ৮৪)।

১৯৩৫ থেকেই জিন্নাহ্ দাবি করতে থাকেন যে মুসলিম লীগ মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৭-এর জানুয়ারির নির্বাচনের পর থেকেই জিন্নাহ্ লীগকে বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে নিয়ে যেতে পরিস্থিতিগত কারণে বাধ্য হন। ড. ইকবাল এই সময় থেকেই একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করতে থাকেন (পৃ ১০০)।

শ্রী ১৯৩৭-১৯৪৭—এই দশ বছর হল পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস। কিভাবে একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হল তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। ১৯৩৭-এ বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা। এই মন্ত্রিসভাকে মুসলিমবিরোধীরূপে চিহ্নিত করছেন। বলছেন, এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'হিন্দুরাজ' প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেস 'হিন্দু প্রতিষ্ঠান।' 'আদর্শ শাসনব্যবস্থাকে গান্ধী কর্তৃক "রামরাজ্য" আখ্যা দেওয়াও মুসলমানদের মধ্যে কম বিভ্রান্তি সৃষ্টির কারণ হয় নি' (পৃ ১১৯)। জিন্নাহ্ এই সুযোগ গ্রহণ করলেন। 'ইসলাম বিপন্ন, একমাত্র দীনই (ধর্ম) বিবেচ্য—এই অতঃপর হয়ে উঠল মুসলিম লীগের একমেব ভূমিকা' (পৃ ১০৫)। তিনি জেহাদি মানসিকতা সৃষ্টি করলেন (১১৮ পৃ) এবং মুসলিম শক্তিকে লীগের ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে আসতে প্রয়াসী হলেন। (পৃ ১২৩, ১৩৩)। 'হঠাৎ জিন্নাহ্ এত জঙ্গী সাম্প্রদায়িকতাবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করলেন কেন'? এই প্রশ্ন তুলে গ্রন্থকার শৈলেশকুমার মন্তব্য করছেন, 'এ হল হিন্দু মহাসভার সমকালীন রাজনীতি, যা হিন্দু-সংস্কৃতি ও হিন্দুর স্বাধিকার রক্ষার নামে প্রত্যুত এই ভূমিকাকেই পুষ্ট করেছিল' (পৃ ১৩৪)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালে সাভারকার ঘোষণা করলেন, 'এদেশে প্রধানত দুটি জাতি হিন্দু ও মুসলমান' (পৃ ঐ)। সাভারকারের 'হিন্দুরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার প্রচার মুসলমানদের শঙ্কিত করে তোলে। গান্ধীও চাইছিলেন 'রাজনীতির অধ্যাত্মীকরণ' (পৃ ১৩৬ এবং ২৯৫)। অদ্বিতীয় রণকৌশল-নির্ধারক ব্যক্তিত্ব জিন্নাহ্ এই সুযোগে নিজেকে 'ইসলামের সেবক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। অপ্রতিরোধ্য করে তোলেন নিজেকে। (পৃ ১৩৭, ১৪৮)। ইকবালকে লিখিত একটি পত্রে জিন্নাহ্ পরিষ্কার করে বলেন, '...আমাদের স্বধর্মীয়রা (People) রাজনৈতিক দৃষ্টিতে অসংগঠিত, শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর এবং আর্থিক ক্ষেত্রে কুত্রাপি তাদের স্থান নেই।' সুতরাং, 'আমি ধাপে-ধাপে তাদের টেনে তুলতে চাই এবং তাদের দৌড়াতে বলার আগে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাই যে তারা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে সক্ষম' (পৃ ১৩৮)। কোনো দ্বিধা না রেখে তিনি ঘোষণা করলেন, 'মুসলিম ভারত এমন কোনো সংবিধান স্বীকার করতে পারে না যার পরিণতি স্বতঃই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার'। তিনি দাবি করলেন, 'জাতি (Nation) শব্দের যে-কোনো পরিভাষা অনুসারে মুসলমানের একটি জাতি এবং তাদের নিজের বাসভূমি, এলাকা এবং রাষ্ট্র চাই' (পৃ ১৫০)। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, 'জিন্নাহ্ কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্ব বা মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রথম প্রবক্তা নন' (পৃ ১৫১)।

১৯৩৯-এ আটটি প্রদেশের কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করল। এই উপলক্ষে 'মুক্তিদিবস' পালনের জন্য জিন্নাহ্ মুসলমানদের আহ্বান করলেন। দ্রাবিড় কাজাঘম্ দলের তরফ থেকে রামস্বামী নাইকার, ড. আম্বেদকারের নেতৃত্বাধীন তফশিলী সম্প্রদায় ফেডারেশন এবং ভারতীয় খ্রীষ্টানদের একাংশ এই কংগ্রেসবিরোধী জেহাদে লীগের সঙ্গে যুক্ত হল। শৈলেশকুমার মন্তব্য করেছেন, 'জিন্নাহ্ মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে মিলিতভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করছেন এবং এটা তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার দ্যোতক এবং প্রশংসনীয়' (পৃ ১৪৭)।

১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হল। এই প্রস্তাবে "পাকিস্তান" শব্দটি কোনোভাবেই উচ্চারিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে জিন্নাহ্‌র এককালের একান্ত সচিব পীরজাদা জিন্নাহ্‌র নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, 'পাকিস্তান শব্দ আমরা চালু করি নি, হিন্দুরাই এই শব্দটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। লাহোর প্রস্তাব তীব্রভাবে সমালোচনা করতে গিয়ে হিন্দুরা পাকিস্তান প্রস্তাব রূপে এর উল্লেখ করেন। তার ফলেই এই শব্দের প্রচলন হয়' (পৃ ১৬৯)। লাহোর প্রস্তাব মুসলমানদের মধ্যে শুধু আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিই নয়, তাঁদের প্রচ্ছন্ন অহমিকাবোধকেও উদ্দীপ্ত করেছিল (পৃ ১৮৭)। 'হিন্দু মহাসভাও হিন্দু অধিকার রক্ষার আন্দোলনের নামে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে সংহত করার সুযোগ দেয়' (পৃ ১৯০)।

ক্রিপস্ ১৯৪২-এর ২৩শে মার্চ দিল্লীতে এসে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। আলোচনার সময় জিন্নাহ্ ঘোষণা করলেন, 'সব দল যদি মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি বা দেশবিভাগ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেয় এবং তার খুঁটিনাটি যদি যুদ্ধশেষে স্থির হবে বলে নির্ধারিত হয় তাহলে বর্তমান সম্বন্ধে আমরা কোনো যুক্তিযুক্ত বোঝাপড়ায় আসতে প্রস্তুত' (পৃ ১৮১)। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে জিন্নাহ্ সমর্থন করেন নি। তিনি কঠোর মন্তব্য করেন, ইংরেজ ভারত ছেড়ে গেলে 'হিন্দুরাজ' প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কংগ্রেস রাজের করুণার উপর মুসলমান ও অপরাপর সংখ্যালঘুদের নির্ভর করতে হবে। তাঁর মতে এই আন্দোলন ছিল 'মুসলিম স্বার্থের উপর মৃত্যু-কল্প আঘাত হানা' (পৃ ১৮২, ১৮৪)।

১৯৪৫-এ সিমলা কনফারেন্স ভেঙে গেল। ১৯৪৬-এ নির্বাচনের প্রাক্কালে গান্ধী এবং কংগ্রেস ও তার 'সবর্ণ হিন্দু নেতৃত্বের' প্রতি জিন্নাহ্‌র আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। তিনি কংগ্রেস দলকে কেবল বর্ণহিন্দুদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করতেন (পৃ ২০৪)। গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে উলপার্টের একটি বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'নাগপুরের প্রকাশ্য অসম্মানের সিকি শতাব্দীর পর তিনি তাঁর যশোহানির ধূলিশয্যা ছেড়ে মৃত্যুর দ্বারদেশে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন জগতের কাছে যেন এই কথা ঘোষণা করতে যে মিঃ গান্ধী মিঃ জিন্নাহ্‌র তুলনায় কোনো অংশেই শ্রেয় নন' (পৃ ২০৬)। গান্ধীর পরই যাঁর সঙ্গে জিন্নাহ্‌র ভিন্ন মানসিকতাজনিত বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে এবং যাঁর কারণে তিনি ক্রমশ আরও আপোসবিহীন সাম্প্রদায়িকতাবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেন তিনি হলেন নেহরু। নেহরু জিন্নাহ্‌র মানসিকতাকে "মধ্যযুগীয় ও সেকেলে" আখ্যা দিয়েছিলেন। জিন্নাহ্ নেহরুকে "পিটারপ্যান" হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন (পৃ ১০৪, ১০৫)। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, 'কুশল মনোবিজ্ঞানী জিন্নাহ্ ভারতীয় মুসলিম মানসিকতার দুটি দিক—হিন্দু প্রভুত্বের ভীতি এবং ইসলামী অহমিকাবোধকে তাঁর ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনী বক্তৃতায় পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগালেন' (পৃ ২০৮)। তিনি এই সময় পুনঃপুন বলছেন, আমরা এমন কোনো ব্যবস্থায় রাজি হতে পারি না যা হিন্দুদের স্বাধীনতা দিয়ে 'হিন্দুরাজ্য' প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে-সঙ্গে মুসলমানদের পক্ষে দাসত্বতুল্য হয়। তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি ....ততদিন মুসলমানদের কোনোমতেই আমি হিন্দুদের ক্রীতদাসে পরিণত হতে দিতে পারি না' (পৃ ২০৮)। নির্বাচনযুদ্ধে মুসলিম লীগের বিপুল সাফল্য মুসলিম জনমানসকে উদ্দীপ্ত করে। "অবিশ্রান্ত স্নায়ুশক্তিসম্পন্ন" জিন্নাহ্ এক বক্তৃতায় বললেন, ভারতবর্ষের মুসলমানরা পাকিস্তান অর্জনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তাঁরা পাকিস্তান চেয়েছিলেন এবং তা পানেনও। নির্বাচনে হিন্দুমহাসভার মুসলমানবিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রকারান্তরে লীগের পাকিস্তান দাবিকেই শক্তিশালী করে—এই মত পোষণ করেছেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক (পৃ ২১১)। সাধারণ নির্বাচনের পর এটি প্রমাণিত হয়ে গেল যে মুসলিম লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কোন্ পথে যাবে, ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকেই তা নির্ধারিত হয়ে গেল।

১৯৪৬-এ ক্যাবিনেট মিশন তার ঘোষণাতেই সার্বভৌম পাকিস্তানের দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। জিন্নাহ্ 'খণ্ডিত ও কীটদষ্ট' পাকিস্তান যেমন চান নি, তেমনি গণ-পরিষদে মুসলিম আসনের সংখ্যার অধিকতর সুবিধা (weightage) পাবার সম্ভাবনা না থাকার কারণে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। তিনি বললেন, পাকিস্তান অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। পাকিস্তান হবেই, কেননা এটি অপ্রতিরোধ্য বিষয়। এই সালেই ১৬ অগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ফলস্বরূপ কলকাতার দাঙ্গা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। ২রা সেপ্টেমবর জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হল। ২রা অকটোবর পর্যন্ত জিন্নাহ্‌র সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনার পর বড়লাট লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে রাজি করালেন। লীগের প্রতিনিধিদের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান সব মিলিয়ে ভারতবিভাগের পথকে প্রশস্ত করল। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মন্তব্য করেছেন, লর্ড মাউন্টব্যাটেন ৪০ কোটি মানুষের দেশে ক্ষমতাহস্তান্তরের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে প্রায় "গেলাম, দেখলাম, জয় করলাম"-এর মত

মানসিকতা দ্বারা চালিত হয়ে দেশবিভাগকে অপরিহার্য ও অশোভনভাবে ত্বরান্বিত করেন যার ফলে হাজার-হাজার নর-নারী শিশুর-মৃত্যু ও মৃত্যুযন্ত্রণা এবং লক্ষ-লক্ষ মানুষের সহস্রবিধ দুর্দশা ঘটেছিল। অবশ্য মাউনটব্যাটেন ভারত-বিভাজনের জন্য মন তৈরি করে বড়লাটের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নি (পৃ ২৬৮)। মাউনটব্যাটেন ভারতে পদার্পণ করার পূর্বেই নেহরুর বিশ্বাসভাজন ও ব্যক্তিগত দূততুল্য কৃষ্ণ মেনন লনডনে তাঁর কাছে এই তদ্বির করে এলেন যে তদানীন্তন পরিস্থিতির সমাধান হল দেশের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে দুটি 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা জরুরি। জওহরলালের অভিমতের প্রবক্তা হিসেবে একাধিকবার কৃষ্ণ মেনন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এমন-কী শ্রীমেনন এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে কলকাতার বদলে পূর্ব পাকিস্তানের যে বন্দরের প্রয়োজন তার জন্য যত ব্যয়ই হোক, চট্টগ্রামকে উন্নত করে পাকিস্তানের হাতে দেওয়া উচিত (পৃ ২৬৯)।

ভারতবিভাজনের জন্য জিন্নাহ্‌র মন তৈরি হলেও খণ্ডিত পাঞ্জাব ও বিভক্ত বঙ্গ সহ পাকিস্তান অর্জন তাঁর কাম্য ছিল না। বড়লাটের কাছে তিনি আবেদন জানালেন যে 'বঙ্গ ও পাঞ্জাবের ঐক্য যেন বিনষ্ট না করা হয়' (পৃ ২৭১)। বিভক্ত পাঞ্জাব ও বাঙলার ভিত্তিতে "বিকলাঙ্গ ও কীটদষ্ট" পাকিস্তান যাতে জিন্নাহ্‌ স্বীকার করে নেন তার জন্য মাউনটব্যাটেন রোগে শয্যাশায়ী চার্চিলের সঙ্গে (২২শে মে ১৯৪৭ খ্রী) দেখা করে জিন্নাহ্‌র জন্য এক বিশেষ বার্তা নিয়ে আসেন (পৃ ২৫৭)। 'বড়লাট জিন্নাহ্‌কে জানিয়ে দিলেন যে ভারতবিভাগের পক্ষে তাঁর তাবৎ যুক্তি পাঞ্জাব ও বঙ্গবিভাজনের পক্ষেও প্রযোজ্য এবং ওই দুই প্রদেশের অমুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করা সম্ভব নয়' (পৃ ২৭১)। ১৯৪৭-এর জানুয়ারিতে শরৎচন্দ্র বসু, সুরাবর্দী এবং আবুল হাশেম সার্বভৌম বঙ্গের (অর্থাৎ এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের) প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেন। আকরাম খাঁ গোষ্ঠীও বঙ্গবিভাজনের বিরোধী ছিলেন, তবে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অবিভক্ত বঙ্গকে পাকিস্তানের অঙ্গীভূত করা। জিন্নাহ্‌ সার্বভৌম বঙ্গের বিরোধী না হলেও পরবর্তী কালে প্রকাশ্য সমর্থন করা থেকে বিরত থাকেন। জওহরলাল, প্যাটেল এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা "সার্বভৌম বঙ্গ" প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। হিন্দু মালিকানার সংবাদপত্রগুলোও তারই প্রতিধ্বনি করে। তাদের আশঙ্কা ছিল যে সমগ্র বঙ্গই তাহলে শেষ অবধি পাকিস্তানের কবলিত হবে (পৃ ২৭৪, ২৭৬)। স্বভাবতই শরৎচন্দ্র, সুরাবর্দী আর হাশেমের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হল।

ব্রিটিশ ১৯৪৮ সালের জুনের পর কোনোমতেই ভারতে থাকতে প্রস্তুত ছিল না। মাউনটব্যাটেন কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্যাটেলকে ভারতবিভাগে সম্মত করেছিলেন। (পৃ ২৪৬)। জওহরলাল 'মাথা কেটে ফেলে মাথাব্যথার চিকিৎসা'-র (পৃ ২৯১) পক্ষপাতী ছিলেন। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করছেন, 'সেই মানসিকতায় চালিত হয়ে হিন্দু জনতার বড় একটা অংশ ও হিন্দু মহাসভার নেতৃবর্গই নয়; এমনকি কংগ্রেসেরও অধিকাংশ নেতা শেষ অবধি দেশবিভাগের অনুকূল হয়েছিলেন' (পৃ ২৯১-৯২)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নেহরুর ভারতবিভাগে রাজি হবার বহু কারণ তাঁর অন্যতম জীবনীকার মাইকেল ব্রেচার (Nehru —A Political Biography) বিশ্লেষণ করেছেন (পৃ ৩৭৬-৩৭৯)। ব্রেচার এ মন্তব্যও করেছেন যে, 'ক্ষমতা-লাভরূপী পুরস্কার প্রাপ্তির' জন্য নেহরু ও প্যাটেল দেশ-বিভাগে সম্মত হন। (পৃ ৩৭৯)। এই তথ্যের হদিশ দিয়েছেন গ্রন্থকার ৩০ অধ্যায়ের ৩৪ নং পাদটীকায় (পৃ ৫৯)।

জিন্নাহ্‌ কোনোক্রমেই পাঞ্জাব ও বঙ্গ বিভাজনের পরিকল্পনাকে সমর্থন করছিলেন না। অসহিষ্ণু মাউনটব্যাটেন জিন্নাহ্‌র হাতে তুলে দিলেন চার্চিলের একটি ব্যক্তিগত চিঠি। তাতে লেখা ছিল: 'দুই হাত বাড়িয়ে আপনি যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ না করেন তবে ব্যাপারটা পাকিস্তানের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন হবে' (পৃ ২৭৯)। ১৯৪৭-এর তেসরা জন জিন্নাহ্‌ মাউনটব্যাটেন-উত্থিত দেশভাগের প্রস্তাব (Partition Plan) 'অনিচ্ছুক মাথা নেড়ে' (রিল্যাকট্যান্ট নড) মেনে নিলেন (পৃ ২৭৯ ২৮০)।

১৯৪৭-এর ৭ অগস্ট জিন্নাহ্‌ করাচী বিমানবন্দরে পৌঁছলেন। করাচীর লাটভবনের সিঁড়ি দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে-করতে তাঁর নবনিযুক্ত সহায়ক নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট এস. এম. আহসানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'জান, আমার জীবিতকালে পাকিস্তান দেখে যেতে পারব—এমন আশা আমি কখনও করি নি। আমরা যা অর্জন করেছি তার জন্য ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত' (পৃ ২৮৩)। 'অতীতকে কবর দিতে হবে এবং আসুন আমরা হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামক দুই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের শুভারম্ভ করি' (পৃ ২৮৩)।

মোট ৩০টি অধ্যায়ের সাহায্যে শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্নাহ্‌র জীবনবৃত্ত বিশেষত তাঁর রোমাঞ্চকর রাজনৈতিক জীবনের রূপান্তরের বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। সাম্প্রদায়িক ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদের ক্ষণপ্রভার ঝিলিক জিন্নাহ্‌র জীবন ও কর্মে বারবার দৃশ্যমান—সে কথাও গ্রন্থকার প্রমাণ-সহযোগে উল্লেখ করেছেন।

জিন্নাহ্‌ কি সত্যসত্যই ভারতবিভাগ করে মুসলমানদের এক স্বতন্ত্র বাসভূমি সার্বভৌম পাকিস্তান চেয়েছিলেন? সাম্প্রতিক কালে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বিষয়টি আগ্রহ-সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মৌলানা আজাদের অভিমত উদ্ধার করেছেন: 'সম্ভবত শেষ অবধি পাকিস্তান জিন্নাহ্‌র একটা দরাদরির বিষয় ছিল।' এস. কে. মজুমদার (Jinnah & Gandhi) থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কালের ড. আয়েষা জালালেরও (The Sole Spokesman) এই মত। তাঁদের বক্তব্য—কংগ্রেস ভারতবিভাজনে রাজি হয়ে যাবে, একথা জিন্নাহ্‌ স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। জিন্নাহ্‌ চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের 'অধিকতর সুযোগ'। তিনি গ্রুপিং পেলেই তৃপ্ত হতেন, মুসলিম সমাজের জন্য কেন্দ্রের শাসন-ব্যবস্থায় মর্যাদাপূর্ণ ভাগ আদায় করাই ছিল তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য। পাকিস্তানের দাবি ছিল তাঁর রাজনৈতিক কৌশল ও চাপ সৃষ্টির অস্ত্র মাত্র। গ্রন্থকার আলোচনান্তে মন্তব্য করেছেন, 'জিন্নাহ্‌ সত্যসত্যই পাকিস্তানের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন কিনা—এই সংশয়ের জোরালো ভিত্তি আছে' (পৃ ৩০০)। উপরন্তু দ্রষ্টব্য: ড. আয়েষা জালাল: দ্য সোল স্পোকসম্যান, পৃ ৩৫-৬০)।

পাকিস্তান নিছক মুসলমানদের দেশ হোক—এটিও তাঁর কাম্য ছিল না। এর বহু প্রমাণ হাজির করেছেন লেখক। দু-একটি উদাহরণ: 'জিন্নাহ্‌ বিশ্বাস অথবা আচারে-বিচারে আদৌ গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না। ...১৯৪৩ সালেও (১লা ফেব্রুয়ারি) বোমবের ইসমাইলি কলেজের এক বক্তৃতায় তিনি বলেন যে ধর্ম হল 'নিছক ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যেকার একটা ব্যাপার।' দেশবিভাগের ঠিক পূর্বে রয়টারের প্রতিনিধি ডুন ক্যাম্পবেলকে জিন্নাহ্‌ বলেন যে নূতন রাষ্ট্রটি হবে, 'এক আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যার সার্বভৌমত্ব থাকবে জনসাধারণের হাতে এবং ধর্ম, জাতি (caste) ও বিশ্বাস নির্বিশেষে নূতন রাষ্ট্রের অধিবাসীরা নাগরিকতার সমান সুযোগ ভোগ করবেন' (পৃ ১৭০)। এমন-কী ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান কোনমতেই ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না যার শাসনের দায়িত্ব থাকে দৈবী উদ্দেশ্যচালিত ধর্মযাজকদের হাতে' (পৃ ১৭১)। আবার ২৫শে অকটোবর রয়টারের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি 'পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সমান অধিকারসম্পন্ন নাগরিকরূপে অভিহিত করেন' (পৃ ২৮৫)। এই বিষয়ে আরও দেখুন (পৃ ২৭৮, ২৮৩)।

অনেকে অভিযোগ করে থাকেন যে তাঁর ভিতর মানবীয় আবেগের ন্যূনতা ছিল এবং তাঁর আচরণ ছিল হিমশীতল এবং ভাবাবেগহীন। সেই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন গ্রন্থকার। পত্নী রুটির সমাধিতে মাটি দেবার সময় জিন্না যেমন কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন তেমনি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ও পাকিস্তান ত্যাগে প্রস্তুত হিন্দু উদ্বাস্তুদের দুঃখদুর্দশার জন্য জিন্নাহ্‌র চোখে জল এসেছিল—তার বর্ণনা দিয়েছেন দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে অবস্থানকারী সাংবাদিক এম. এস. এম. শর্মা, জিন্নাহ্‌র অন্যতম জীবনীকার হেকটর বলিথো, ফতিমা জিন্নাহ্‌ এবং জিন্নাহ্‌র অনুগামী মীর লায়েক আলি। দেশ বিভাগের সময়ে করাচীর মেয়র পার্শী জামশেদ নসরওয়ানজী বলেন, 'আমার সানুনয় মিনতি—বিশ্বাস করুন শ্রীযুক্ত জিন্নাহ্‌ মানবদরদী ছিলেন। চোখের জল ফেলার ব্যাপারে কোন দিনই তাঁর মধ্যে কোন প্রবণতা ছিল না—না, আদৌ না। কিন্তু দুবার আমি তাঁকে অশ্রুমোচন করতে দেখেছি। ......সে সময়ে আমি তাঁর সঙ্গে হিন্দুদের এক শিবিরে গিয়েছিলাম।......শিবিরের বাসিন্দা সেইসব হিন্দুদের দুর্দশা দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন।' এমন বহু তথ্যের হদিশ দিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা (দেখুন, পৃ ৫-৭, ৫৭, ২৮৫, ২৮৯-২৯০)।

জিন্নাহ্‌র ব্যক্তিগত জীবনও ছিল বিয়োগান্তক। তাঁর প্রথমা পত্নী অল্প বয়সে—জিন্নাহ্‌ বিলেতে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই—মারা যান। প্রণয়সূত্রে জিন্নাহ্‌ রুটিকে বিবাহ করেছিলেন ১৯১৮ সালে। পার্শী সম্প্রদায়ের স্যর দীনশাহ পেটিটের সুন্দরী কন্যা রুটি (রতনবাই / রাতি) মানসিক হতাশার শিকার হন। অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। একমাত্র সন্তান কন্যা দীনাকে অশেষ স্নেহ করতেন। কিন্তু তাঁর

অমতে বিবাহ করার জন্য সারা জীবন কন্যার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন নি। ভগিনী ফতিমা জিন্নাহ্‌ই ছিলেন তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ব্যক্তি। জিন্নাহ্‌র পারিবারিক জীবনের বেদনার সহৃদয় বর্ণনা দিয়েছেন লেখক (পৃ ২৯৭-২৯৮)। তাঁর মনে হয়েছে জিন্নাহ্‌ যেন গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়কের মতো যিনি শত প্রয়াস সত্ত্বেও জীবনের নানা পর্যায়ে শোচনীয় পরিণতি এড়াতে পারেন নি (পৃ ৩০২-৩০৩)।

"জিন্নাহ : পাকিস্তান—নতুন ভাবনা"-গ্রন্থটিতে সংযোজিত হয়েছে বর্ষীয়ান চিন্তাবিদ অন্নদাশঙ্কর রায় লিখিত অসাধারণ মূল্যবান একটি ভূমিকা। জিন্নাহ্‌ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তানে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। খেলায় বাজী ধরে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন। সেটা কংগ্রেসেরই কৌশলে' (পৃ ১২)। তিনি আরও লিখেছেন যে রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই, জবাহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং কৃপালনী গান্ধীজীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাধাদানে নিরস্ত করে দেশভাগ করিয়ে নিয়েছিলেন—সেটিও কম সত্য নয়। আমরা যেন জিন্নাহ্‌কেই পুরোপুরি দায়ী না করি' (পৃ ঐ)। তিনি সাহসের সঙ্গে লিখেছেন, 'সবাইকে হিন্দু বানাবার উদগ্র বাসনা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়। জিন্নাহ্‌ প্রমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আত্মায় না করে পর করে দেয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের হিন্দু-পুনরুজ্জীবনকামী শাখা। ..... জিন্নাহর কংগ্রেস ত্যাগের পশ্চাতে সেটাও কাজ করছিল' (পৃ ১৩)। তাঁর বিশ্বাস, 'রোম যেমন একদিনে নির্মিত হয় নি পাকিস্তানও তেমনি একদিনে সংস্থাপিত হয় নি' (পৃ ১৪)। এটি বোধ হয় স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে ইতিহাসের কাঠগড়ায় শুধুমাত্র জিন্নাহ্‌কেই জবাবদিহি করতে হবে না।

প্রতিটি তথ্যের সূত্রনির্দেশ এবং আকরগ্রন্থের লেখক-বর্গের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পাদটীকায় উত্থাপন করতে গ্রন্থকার শৈলেশকুমার ব্যবহার করেছেন ৯০টি মূল্যবান পৃষ্ঠা। এ-জাতীয় গবেষণামূলক গ্রন্থে প্রত্যাশিত 'নির্ঘণ্ট' যন্ত্রসহকারে গ্রথিত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে কোনো-কোনো তথ্যের পুনরুক্তি ঘটেছে, অবশ্য প্রতিটি অধ্যায়কে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে তা জরুরি ছিল। জিন্নাহ্‌র নবতম এক ভাবমূর্তি নির্মাণ করেছেন তিনি। বাঙলা ভাষায় এমন গবেষণা-কর্ম এর আগে প্রকাশিত হয় নি। 'অতীতের ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সাম্প্রতিক কালের বিচ্ছিন্নতাবাদের আক্রমণের সম্মুখীন হবার বুদ্ধি ও সাহসের সন্ধান দিতে' অশেষ পরিশ্রমসহকারে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন লেখক। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে এই গ্রন্থপাঠ অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

"আধুনিক ভারত : ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ" বইটি বিপান চন্দ্রের ইংরেজি বই "ন্যাশনালইজম অ্যান্ড কলোনিয়ালইজম ইন মডার্ন ইন্ডিয়া"র অনুবাদ। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে লেখা আপাত-বিচ্ছিন্ন মোট চোদ্দটি প্রবন্ধ আলোচ্য বইটিতে সংকলিত। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটা অন্তর্লীন যোগসূত্র রয়েছে। ১. ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকীকরণ, ২. উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা, ৩. ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি (১৮৮৮-১৯০৫) : ব্রিটিশ ও ভারতীয় ধারণা, ৪. ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের উপাদান : আদি জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপ, ৫. ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ : ১৯৪৭ সালের আগে, ৬. জওহরলাল নেহরু ও পুঁজিপতি শ্রেণী : ১৯৩৬ সাল, ৭. আধুনিক ভারত ও সাম্রাজ্যবাদ, ৮. ১৯২০-র দশকে উত্তর ভারতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী : আদর্শগত বিকাশ, ৯. ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা, ১০. লর্ড ডাফরিন ও ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের চরিত্র, ১১. লেনিন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, ১২. কৃষকসম্প্রদায় ও জাতীয় সংহতি : সমকালীন ভারতবর্ষ, ১৩. তিলক এবং ১৪. এক-নায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সামাজিক উৎস—এই প্রবন্ধগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ঠিক হবে না। ঔপনিবেশিকতাবাদের সম্প্রসারণ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণজালবিস্তার আলোচ্য বইটিটিতে যেমন পরিস্ফুট, তেমনি পাশাপাশি দেখানো হয়েছে জাতীয়তাবাদের চরিত্রও নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে কী ভাবে অষ্টাবক্রস্বরূপ নিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার বেনোজলে কলুষিত হয়েছে আমাদের সাধের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। সেই সঙ্গে দেখানো হয়েছে, পুঁজিবাদীদের শোষণজালে কীভাবে সমর্পিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় অর্থনীতি। বিপান চন্দ্র এই বইয়ের ভূমিকাতে তাঁর উদ্দেশ্যটিকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন : '...এই প্রবন্ধগুলিকে আমার দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ, প্রাথমিক খসড়া বলা যেতে পারে। সুস্পষ্ট বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এগুলি রচিত হয়নি। এইসব প্রবন্ধ পড়ে পাঠকের যদি মনে হয় যে উত্থাপিত প্রবন্ধগুলি তাৎপর্যপূর্ণ এবং পরিস্ফুট দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা আছে, এগুলি একত্রিত করে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য তাহলে আমার সার্থক হয়েছে বলতে হবে। ..... রাজনীতি, অর্থনীতি, ও মতাদর্শের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সরকারি নীতি, ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যের মধ্যে, কোন আন্দোলন, তার সামাজিক ভিত্তি, তার উদ্দেশ্য, তার ভাবধারা, ও তার নেতৃত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে যত স্পষ্ট ও সার্থকভাবে অন্বেষণ করা সম্ভব হয়েছে, এমন আর কোথাও হয়নি।' লেখক মার্কসবাদের নিরিখে গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসদৃষ্টি ঔপনিবেশিক শোষণ ও শৃঙ্খলার মূল কারণগুলিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করেছে। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদের বিকাশের রূপটিও ধরা পড়েছে।

এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ "ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকীকরণ"। ১৯৭০ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণ হিসেবে প্রবন্ধটি পঠিত। ঔপনিবেশিক শাসনকর্তারা ভারতীয় অর্থনীতির আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং এই ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও কেন ভারতীয় অর্থনীতি পিছনে পড়ে রইল, অর্থাৎ সঠিক অর্থে আধুনিকীকরণ হল না—সে বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্লেষিত হয়েছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সারা পৃথিবীতে অর্থ-নৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ওই সময়ে ভারতীয় ধনিক ও বণিক শ্রেণী 'পাহাড়-পরিমাণ মুনাফাও অর্জন করে'। সে সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্য কিছুটা পিছু হটেছিল সন্দেহ নেই। এর পিছনে ছিল নানান বাস্তব কারণসমূহ। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, 'যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি সামলে' ব্রিটেন ১৯২১ সালের পরে ভারতে তাদের বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত করে এবং 'ভারতীয় শিল্পগুলির বিপুল মুনাফা ব্রিটিশ মূলধনকে বিরাট আকারে আকর্ষণ করল'। তবে ভারতীয় ধনিক-বণিকশ্রেণীও ক্রমশই ভারী শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠছিল এবং 'ব্রিটিশ মূলধনের নতুন করে প্রবেশের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করল।' এই প্রতিবাদের কোনো বড়ো রকমের ফল দেখা যায় নি, কারণ ঔপনিবেশিক কাঠামোয় ভারতীয় বণিকদের পুঁজির যথেষ্ট বিকাশ সম্ভব ছিল না। ফলে, বিপান চন্দ্রের মতে, 'অনগ্রসর অর্থনীতির চিরায়ত 'মডেল'ই থেকে গেল।' কারণ, ভারতীয় পুঁজি-বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধাসামন্ততান্ত্রিক। তা ছাড়া, দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ শাসনাধীন থেকেও ভারতীয় অর্থনীতে বিকশিত না হওয়ার কারণানুসন্ধান করেছেন বিপান চন্দ্র। তাঁর মতে, ১. 'জাতি-ভেদ, যৌথ পরিবার ইত্যাদির মত আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পরিচালিত আচার, অভ্যাস, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল, ২. অতীত অনগ্রসরতার ভার এত বিপুল যে বাইরে থেকে আসা আধুনিকীকরণ তাতে বেশ বড় রকমের কোনো ভাঙন ধরাতে পারে নি', ৩. বিদেশীদের নির্মম শোষণ ও অর্থনৈতিক নির্গমন। সর্বোপরি, সমস্ত কিছুর মূলে ছিল ঔপনিবেশিকতার ভূমিকা। আসলে, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূলে ঔপনিবেশিক সরকারের অনিচ্ছা আর ব্যর্থতাই ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। দাদাভাই নওরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদগণ এই ব্যাপারটি খুঁটিয়ে আলোচনা করেছেন। পরবর্তী কালে রজনী পাম দত্ত এই বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বিপান চন্দ্র আধুনিকীকরণের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভারতীয় বাস্তবতার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, 'উনিশ শতকে আধুনিকীকরণের অর্থ ছিল ব্রিটেনে শিল্প-পুঁজিবাদের বিকাশ এবং ভারতে ঔপনিবেশিকতা ও অনগ্রসরতার বিকাশ, ঠিক তেমনি আজ আবার আধুনিকীকরণের অর্থ হল সমাজতন্ত্র কিংবা অনগ্রসর পুঁজিবাদ। সব সময়েই তা পশ্চাদ্‌মুখী প্রবণতা বা নয়া উপনিবেশবাদের দ্বারা বিপাদগম্য।'

দ্বিতীয় প্রবন্ধ "উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা"য় মরিস ডি মরিসের ১৯৬৩ সালে 'জার্নাল অব ইকনমিক হিস্ট্রি'তে প্রকাশিত "টুওয়ার্ডস এ রি-ইনটারপ্রিটেশন অব নাইনটিনথ সেনচুরি ইনডিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি"র সমালোচনা করা হয়েছে। মার্কস এবং পাশ্চাত্যদেশীয় অন্যান্য অর্থনীতিবিদের মতামত এখানে যেমন আলোচিত, তেমনি ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গি

আধুনিক ভারত : ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ—বিপান চন্দ্র, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭। পঞ্চাশ টাকা।

উপেক্ষিত হয় নি। একদা মরিস ডি মরিসের সঙ্গে তপন রায়চৌধুরীর যে বিতর্ক হয়েছিল, তাও এই প্রবন্ধপাঠের সময় স্মরণ করা যেতে পারে। বিপান চন্দ্রের মতে, 'মরিস উনিশ শতকের অর্থনৈতিক ইতিহাসের নতুন কোনো ব্যাখ্যা উপস্থিত করছেন না।' তিনি সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ সরকারি-বেসরকারি বইপত্র এবং তথ্যাবলীকে নতুন অর্থনীতির পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। অথচ মজার বিষয় হচ্ছে এই যে, তাঁর পূর্বসূরীদের প্রতি তিনি কোনো কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করেন নি। মরিসের রচনায় কাঠামোগত বিশ্লেষণই প্রাধান্য পেয়েছে। বিপান চন্দ্র যথার্থই বলেছেন, 'উনিশ শতকের অর্থনৈতিক কাঠামো কেমন ভাবে বিকাশ লাভ করেছিল কিংবা বাস্তব অর্থনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার সঙ্গে কাঠামোগত পরিবর্তনগুলির সম্পর্ক কী, তার একটি দিকও তিনি আলোচনা করেন নি।' শুধুমাত্র মাথাপিছু আয় ও আতায় উৎপাদনের বস্তুগত দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বাণিজ্যের বিস্তার এবং পরিবহণের সুব্যবস্থা ভারতীয় অর্থনৈতিক বিকাশকে সাহায্য করবে। মরিস কখনো-কখনো মার্কসের বক্তব্যে নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থন খুঁজেছেন। কিন্তু কোন্ বক্তব্যে কী সমর্থন তিনি চান, তা অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াটে। ভারত অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্থনীতির দিক থেকে পশ্চাৎপদ ছিল কেন, তা মরিসের লেখায় স্পষ্ট নয়। তাই বিপান চন্দ্র বলেন, 'মরিস মূল প্রশ্নটি উপেক্ষা করতে চান, কিন্তু তাঁকে যখন চেপে ধরা হয়, তখন তিনি মূলত বিংশ শতকের পূর্বেকার সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যা ও আলোচনাকে অবলম্বন করেন।' বরং বিপান চন্দ্র এই প্রবন্ধের শেষে সঠিক মন্তব্যই করেছেন, 'ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে ঔপনিবেশিক স্তরে নামিয়ে আনার কারণে ব্রিটিশ শাসন এ দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য দায়ী।'

১৯৬৬ সালে বিপান চন্দ্রের গবেষণামূলক গ্রন্থ "দি রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশনালইজম ইন ইন্ডিয়া" প্রকাশিত হয়। মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ১৮৮০ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যবর্তী কালের ভারতের অর্থনৈতিক নীতিসমূহ এবং জাতীয় নেতৃত্ব। বর্তমান আলোচ্য বইয়ের তৃতীয় প্রবন্ধ "ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি (১৮৫৮-১৯০৫): ব্রিটিশ ও ভারতীয় ধারণা"তে উপরি-উক্ত গবেষণামূলক বইয়ের বক্তব্যের ছায়াপাত অনেকটাই লক্ষণীয়। বিপান চন্দ্রের মতে, 'ভারতের অর্থনীতির ক্রমবির বুনিয়াদকে এ সময়ে সচেতনে ক্ষয় ও ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, শিল্পে দেশজ এক পুঁজিবাদী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল এবং জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভিত্তি দৃঢ়মূল হয়েছিল।' তথাপি 'ভারতীয় লেখকরা এটাকে দেখেছিলেন ঐতিহাসিক বা সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাদ্বর্তিতা থেকে ঔপনিবেশিক পশ্চাদ্বর্তিতায় রূপান্তর হিসেবে।' জাতীয়তাবাদী লেখকেরা দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা কিভাবে আধুনিকীকরণের নামে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য এ দেশে পিছিয়ে পড়ছিল; তার ওপর আবার ছিল ঐ বিদেশীদেরই আধিপত্য। এইভাবে "ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ধারণা" তৈরি হয়। অপর পক্ষে, ব্রিটিশ লেখকরা ভারতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার পশ্চাদ্বর্তিতার তত্ত্ব অস্বীকার করেছেন, অথচ 'তাঁদের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল।' নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই তাঁরা উলটো গাইতে শুরু করেছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে তত্ত্ব দাঁড় করিয়াছিলেন তার মূল উদ্দেশ্য হল, ঔপনিবেশিক শাসন টিকিয়ে রাখতে হবে ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্বার্থেই। উইলিয়াম লী-ওয়ার্নার, এম. ই. গ্র্যান্ট ডাফ, রিচার্ড টেম্পল, লয়াল প্রমুখেরা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদেরই সমর্থক। বিপান চন্দ্র দেখিয়েছেন, 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দুর্বলতম অংশ হল তাঁদের কৃষি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি।' আধাসামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা এ দেশের উন্নতির পথে যে অন্তরায় ছিল তা বলাই বাহুল্য। বিপান চন্দ্রের বিশ্লেষণে ভারতীয় আর্থনৈতিক পরিস্থিতির চেহারা স্পষ্ট হয়েই উঠেছে।

চতুর্থ প্রবন্ধ "ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের উৎস: আদি জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপ"। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তিনটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করার পক্ষপাতী বিপান চন্দ্র। ১৯০৫ সালের আগের পর্ব, ১৯০৫ থেকে ১৯১৯ দ্বিতীয় পর্ব এবং তৃতীয় পর্ব হচ্ছে ১৯১৯ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কাল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীরা চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দুটিভাগে বিভক্ত হলেও উভয়েই একই কাঠামোর ভেতর কাজ করেছে। নরমপন্থারা 'ধরেই নিয়েছিলেন যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আপাতত সমাজের শিক্ষিত স্তরে বা তাঁদের ভাষায় "শিক্ষিত শ্রেণীর" মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।' ব্রিটিশ সরকারেরও ছিল জনসাধারণের প্রতি অনাস্থা। মুষ্টিমেয় চরমপন্থী নেতা জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে পেরেছিল, কিন্তু, বিপানচন্দ্রের মতে, 'বাংলায় চরমপন্থী আন্দোলনের তুঙ্গ অবস্থাতেও কৃষকসম্প্রদায়কে লড়াইতে সামিল করা হয় নি।' চরমপন্থী নেতারা আন্দোলনের সঠিক

পথও দেখাতে পারেন নি, এমন-কী নরমপন্থীদের সঙ্গে রাজনৈতিক পার্থক্য কোথায় তাও বুঝতে বা বোঝাতে সক্ষম হন নি; ফলে সৃষ্টি হয়েছে সন্ত্রাসবাদ। জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে রাখার ফলেই জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি পাকাপোক্ত হয় নি। অবশ্য গান্ধী জনসাধারণের ওপর অনেকটা আস্থাশীল ছিলেন। বিপান চন্দ্রের মতে এই সাধারণ মানুষদের কখনোই রাজনৈতিক দিক থেকে সংগঠিত করা হয় নি। রাজনীতির ব্যাপারটাই ছিল সাধারণত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অপর পক্ষে 'গান্ধীযুগে আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি পুঁজিপতি শ্রেণী পর্যন্ত' সম্প্রসারিত ছিল। গান্ধীর চিন্তা ও কর্মধারা কৃষককেন্দ্রিক—এ ধরনের মতের সঙ্গে বিপান চন্দ্র মোটেই একমত হতে পারেন নি। তাঁর প্রশ্নে এ দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর উত্থান কোনো অরাজনৈতিক ব্যাপার নয়। এ বিষয়টি নিপুণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে 'ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ: ১৯৪৭ সালের আগে' এবং 'জওহরলাল নেহরু ও পুঁজিপতি শ্রেণী: ১৯৬৬ সাল' প্রবন্ধ দুটিতে। গান্ধী কিভাবে ভারতীয় পুঁজিপতিদের কাছে আত্মসমর্পণ করছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে উঠছিলেন তা এই প্রবন্ধ দুটিতে বেশ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। এদিকে জওহরলাল ১৯৩৩-৩৬ সালে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মার্কসবাদী বিপ্লবী হয়ে উঠেছিলেন।' তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হন। তাঁর সমালোচনা করে তিনি 'গান্ধীযুগে অক্ষুণ্ণ থাকা বুর্জোয়া রাজনৈতিক মতাদর্শগত আধিপত্যকে ক্রমশঃ দুর্বল করে তোলেন।' এতে গান্ধীও স্বয়ং কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েন। অবশ্য ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী আস্তে-আস্তে নেহরুর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। নেহরুর সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের অবসান, ক্রমশ আত্মসমর্পণ প্রভৃতি বিষয়গুলি খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন বিপান চন্দ্র। আবার "আধুনিক ভারত ও সাম্রাজবাদ" প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই দেখিয়েছেন যে নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে মনোযোগী। শুধু তাই নয়, বামপন্থীদের দুর্বলতাও যে 'পুঁজিবাদকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছে' সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"২২-র দশকে উত্তর-ভারতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী: আদর্শগত বিকাশ" প্রবন্ধে কমিউনিস্টদের সঙ্গে কানপুর, এলাহাবাদ ও পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা একই সঙ্গে আন্দোলনে যোগদান করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব পড়েছে তাদের ওপর। বিপ্লব সংক্রান্ত বইপত্র সংগ্রহ, পাঠ এবং পাঠচক্রের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। তাঁদের মনে আসে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা। অথচ সঠিক নেতৃত্বের অভাবের ফলে সঠিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারল না। নেতৃত্বের বিচ্যুতি সম্পর্কে লেখক এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে বিপান চন্দ্র এই বইতে নিরপেক্ষ আলোচনার অবতারণা করেছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারায় সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। '১৮৮০-র দশক থেকেই জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা চলছিল।' এই প্রচেষ্টা বিভেদকামী রাজনীতির জন্ম দেয়। অবশ্য সেই সঙ্গে-সঙ্গে উচ্চবিত্ত মুসলমান নেতাদের তোষণ করার অলিখিত নীতি গৃহীত হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চবিত্ত নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক দরকষাকষি ও স্বার্থ-সংঘাতে পিষ্ট হয়েছে সাধারণ মানুষ, বলি হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার। জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে রেখে সাম্প্রদায়িক নেতাদের গুরুত্ব দেওয়ায় সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আবুল কালাম আজাদ বা আসফ আলির মতো কিছু জাতীয়তাবাদী নেতা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে চেষ্টা চালিয়ে যান। বামপন্থী আন্দোলনের স্তূপোত হওয়ায় সাম্প্রদায়িকতা কিছুটা দূর হয়। জনসাধারণ আন্দোলনের শামিল হয়, এবং সাম্প্রদায়িক নেতারা কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হন। হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের দাপটের ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পর্যুদস্ত হয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী সমস্যাকে বাড়িয়েই তুলেছিল। বিপান চন্দ্র "ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা" প্রবন্ধের সিদ্ধান্তে যথার্থই বলেছেন, 'র‍্যাডিক্যাল পথেই হোক আর রক্ষণশীল পথেই হোক, সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সমাধান ছিল না। একমাত্র শক্তিশালী বামপন্থী ও গণভিত্তিক রাজনীতিই এর সমাধান করতে পারত।'

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুশ্রেণীভুক্ত নরমপন্থী, তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে মোটেই ভীতিকর ছিলেন না, বরং সন্ত্রাসবাদী বা চরমপন্থীরাই তাঁদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল। ফলে সরকার এঁদের ওপর কঠোর দমননীতি চালাতে বাধ্য হন।

এই জাতীয়তাবাদের কণ্ঠরোধ করা তাঁরা প্রয়োজনীয় মনে করেছেন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব টি'কিয়ে রাখার জন্য। বিপান চন্দ্র তাঁর প্রবন্ধগুলিতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতাদর্শের ভিত্তিতে বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

বর্তমান বইটি আধুনিক ভারত-ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন সন্দেহ নেই। বইটির বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করে প্রকাশক বাঙালি পাঠকদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। অনুবাদের ভাষা আরও যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদিত হলে বইটি সুখপাঠ্য হত।

মতামত

১

প্রসঙ্গ : সাহিত্যসাধকচরিতমালা

"চতুরঙ্গ" অকটোবর, ১৯৮৮ সংখ্যায় গ্রন্থসমালোচনা অংশে "দুই বঙ্গের জীবনীচর্চা" শিরোনামে নয়খানি গ্রন্থের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে 'প্রত্যেকটিরই প্রকাশক বাংলা একাডেমী।' এই একাডেমী বাংলাদেশের। সাড়ে সাত পাতার এই আলোচনায় তিন পাতা জুড়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সমালোচনা করা হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মুসলিম সাহিত্যসাধকগণের চরিত রচনায় অনাগ্রহী, এটাই সমালোচকের বক্তব্য। তার জন্য তিনটি পাতা লেখার পর তিনি লিখলেন, 'ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হচ্ছে বলে অনেকে মনে করতে পারেন।' আমরা মনে করি তাই। তাঁর অভিযোগ কয়েকটি বাক্যেই শেষ করা যেত বলে আমাদের ধারণা।

এ পর্যন্ত ১৩৪খানি সাহিত্যসাধক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ-র সাহিত্যসাধক রচনাকালে 'তৎকালীন সম্পাদক জল ঘোলা' করেন নি, বরং উৎসাহী হয়ে সেটি প্রকাশে আগ্রহী হয়েছিলেন। তবে পাণ্ডুলিপিটিকে প্রকাশযোগ্য করে তোলার জন্য প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটেছিল। সাহিত্য অকাদেমী এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ড. শহীদুল্লাহ-র জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছিল পরিষৎ-মন্দিরে। জসীমউদ্দীন ও আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের সাহিত্যসাধক রচনার দায়িত্ব যথাক্রমে বর্তমান পত্রলেখক এবং ড. শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া আছে। নজরুলের সাহিত্যসাধক লিখেছেন ড. সুশীলকুমার গুপ্ত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধক রচনার দায়িত্ব অর্পিত আছে পরিষদের বর্তমান সভাপতি জগদীশ ভট্টাচার্যের ওপর। বহুকাল পর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ দশ বছর আগে বাঙলা ভাষার শতাধিক সাহিত্যসাধকের চরিত রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আর্থিক কারণে ও লেখকগণের ঔদাসীন্যে তা প্রত্যাশিতভাবে এগোচ্ছে না। সমালোচক যেসব সাহিত্যসাধকের উল্লেখ করেছেন তাঁদের বিষয়ে সাহিত্যসাধক চরিত রচনার জন্য বর্তমান কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী
[প্রাক্তন সহ-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ]

২

'প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার'

"চতুরঙ্গ" পত্রিকার অগস্ট ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত ড. ভবতোষ দত্তের "প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার" লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি।

আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ড. দত্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারকে যে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা সত্যি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে যুক্ত দেশের অগ্রগতি—প্রাথমিক শিক্ষা বিনা 'দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে' দেশের কোনো বিকাশই সম্ভব নয়।

মৃত্যুর এক বছর আগে মহামতি লেনিন রাশিয়ায় ব্যাপক অজ্ঞতা এবং নিরক্ষরতা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে শিক্ষার বিস্তারকে অগ্রাধিকার দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর লেখার একটি অংশ এইরকম : ...We shall have to cut down the expenditure of government departments other than the People's Commissariat of Education, and the sums thus released should be assigned for the latter's needs...

Pages From a Diary, Jan 4 1923,
Selected Works, vol 3, 1977.

সুনীল সেন

৩

"সাহিত্যের পরিচয় : ভাষা, দেশ না আবেগে?"

সেপটেমবর ১৯৮৮-র "চতুরঙ্গে" শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ "সাহিত্যের পরিচয় : ভাষা, দেশ না আবেগে?" পাঠ করে একটি প্রশ্ন জেগেছে মনে। শুভেন্দুবাবু প্রবন্ধটির

এক জায়গায় লিখছেন, ইংরেজি সাহিত্য অর্থে ইংরেজের লিখিত সাহিত্য নয়। তাঁর এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি ইংরেজ নয় এমন ইংরেজি ভাষার কিছু লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন লেখকও বর্তমান। কেউ মার্কিনি, কেউ-বা অন্যদেশবাসী। এবং সম্ভবত এই কারণেই ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত লেখকরা বা তদ্জাতীয়রা ইংরেজ সাহিত্যের লেখকরূপে গণ্য হবেন না।

উদাহরণস্বরূপ, প্রবন্ধলেখক আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের ও আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৭-এ ভারতবিভাগের পর থেকে প্রথম পূর্ব-পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাটিকে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আর গণ্ডিবদ্ধ করা যাবে না। তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে উঠেছে। যে অস্তিত্ব ভাষানির্ভর না হয়ে দেশনির্ভর হতে পারে। শুভেন্দুবাবুর এই মতামত অগ্রাহ্য করার নয়। কারণ, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আধুনিক বাঙলা কবিতার সঙ্কলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত কবিরাও অনুপস্থিত। যেমন অনুপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত দেশবিভাগপরবর্তী আধুনিক বাঙলা কবিতার সঙ্কলনে পূর্ব-পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশের সব খ্যাতিমান আধুনিক কবির নাম। "দুই বঙ্গের কবি" শিরোনামে (শামসুর রহমান ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত) সদ্যঃপ্রকাশিত পুস্তকটিও ভাষাগত সাম্মিধ্য সত্ত্বেও দেশগত বিভেদের কথাই পরিস্ফুট করে—আর-একবার প্রমাণ করে শুভেন্দুবাবুর বক্তব্যের যথার্থতা। কিন্তু এর বিপরীত নজিরও আমরা দেখতে পাই—যেখানে শুভেন্দুবাবুর বক্তব্যের যথাযথ সমর্থন মেলে না। দেশটি অবশ্য আমাদের প্রতিবেশী কোনো দেশ নয়। সেটি প্রায় আক্ষরিক অর্থে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের দেশ ইংল্যানড। ইংল্যানডের অধিবাসীরাই ইংলিশম্যান। যার বাঙলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় ইংরেজ। এবার ইংরেজের রচিত সাহিত্যই ইংরেজি সাহিত্য বললেও তার সাহিত্যের ইতিহাসে কিন্তু সে কথা লেখা নেই। লেখা নেই অর্থে, এমন সব ঔপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকারের নাম সেই দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হতে দেখি যাঁরা কোনো-কালে ইংলিশম্যান বা ইংরেজ ছিলেন না, হবেনও না। তাঁরা তাঁদের রচনাশৈলীর গুণগত মর্যাদায়ও একটি ভিন্নতর দেশ আর জাতির প্রতিভূ, সেই সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যেরও প্রতিনিধিস্থানীয়। অথচ ইংল্যাণ্ডের নিকট প্রতিবেশী, একদা যার সমগ্র ভূখণ্ড ছিল ইংরেজ শাসনাধীনে, বর্তমানে যার একটি অঞ্চল মুক্ত, অপর অঞ্চলটি মুক্তির জন্য লড়াই করে চলেছে। ইংল্যানড থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানচিত্র যার—ইউরোপের সেই ভূখণ্ডটির নাম আয়ারল্যানড। তার অধিবাসী কবি, নাটকের আর ঔপন্যাসিকদের নাম ইংরাজি সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে বরাবর উল্লিখিত হয়ে আসছে। অসকার ওয়াইলড, ডব্লু. বি. ইয়েটস, বার্নার্ড শ প্রমুখেরা ইংরেজ না হয়েও ইংরাজি সাহিত্যের লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন চিরকাল।

অশোক মৈত্র

রোজই দেখি দাড়ি কামানোর শেষে চড়চড়ে
মুখ, মাঝে মাঝে টুকটাক কেটে যাওয়ার দাগ।
রোজই ভাবি—ভাগ্যিস্ বোরোলীন আছে।

রোজ সকালের সাথী

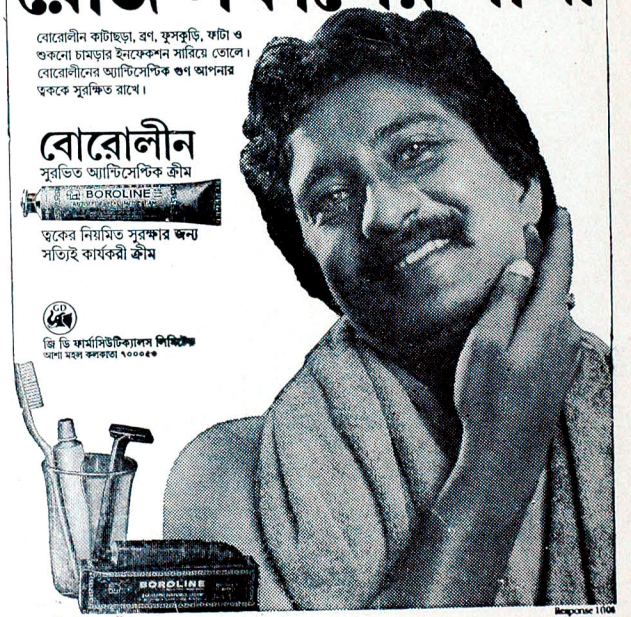

এটি প্রসাধন সামগ্রী নয়।

Response 1108